ওঁ তৎসৎ

১৭৯১ শাকের

দশোপদেশ।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশকর্তৃক

সম্পাদিত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্র।

কলিকাতা।

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ ১৭৯২ শক।

ওঁ তৎসৎ

১৭৯১ শকের

দশোপদেশ।

শ্রীআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশকর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

আদি ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্র।

কলিকাতা।

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রাবণ ১৭৯২ শক।

বিজ্ঞাপন।

১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান পূর্ব্বক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই এই পুস্তকে একত্র সংকলিত হইল। যে উপদেষ্টা যে দিবসে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, যথাক্রমে নিম্নে তাহা প্রকাশ করা গেল।

১ মাঘ বৃহস্পতিবার—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২ মাঘ শুক্রবার——শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী।

৩ মাঘ শনিবার——শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। (পাতুরে ঘাটা)

৪ মাঘ রবিবার——শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫ মাঘ সোমবার——শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

৬ মাঘ মঙ্গলবার——শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ী।

৭ মাঘ বুধবার——শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়।

৮মাঘ বৃহস্পতিবার—শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়।

৯ মাঘ শুক্রবার——শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়।

১০ মাঘ শনিবার——শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

——০——

প্রথম উপদেশ।

১ মাঘ বৃহস্পতি বার ১৭৯১ শক।

"ব্রহ্মবাদিনোবদন্তি"

মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির প্রণালী বিবেচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, ঈশ্বর যেমন এক একটী পরমাণুর সহিত এক একটী পরমাণুর সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, তেমনি এক একটী মনুষ্যের সহিত এক একটী মনুষ্যের, এক একটী আত্মার সহিত এক একটী আত্মার ও আর আর তাবতীয় বাহ্য পদার্থের সহিত ঐ মনুষ্যের কোন না কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য যে অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক ঘটনা ও প্রত্যেক পদার্থের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। সেই সকল পদার্থ ও সকল ঘটনাই তাহার শরীর মন ও আত্মার উন্নতির পক্ষে সহায়তা করিয়া থাকে।

যিনি ধর্ম্ম পথে কতক দূর মাত্র গমন করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, কত সময়ে এক একটী বিশেষ ঘটনা বা পদার্থ দ্বারা প্রত্যাহত বা উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্ম বিষয়ক এক একটী সত্য লাভ করিয়াছেন। কত সময়ে এক এক জন মহাত্মার উৎসাহ-জনন জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়া ধর্ম্ম সাধনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, কত সামান্য ঘটনা তাঁহাকে প্রচুর উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহার মনে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই সকল দেখিলে কে না প্রতীতি করিবেন যে আমরা যে অবস্থায় আছি, ইহা আমাদের জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ উপযোগী। করুণাময় ঈশ্বর কত প্রকারে আমাদিগকে শিক্ষা দেন, কত প্রকারে আমাদের উন্নতি বিধান করেন, তাহা কে নির্ণয়

পারিতে পারে? এক বিষয়ে নয়—এক রূপে নয়—এক উপায়ে নয়, সহস্র বিষয়ে—সহস্র প্রকারে—সহস্র উপায়ে তাঁহার প্রসাদ-বারি আমাদের আত্মার উপর বর্ষিত হইতেছে। “য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।”—সেই একোঽবর্ণো জগদ্বিধাতা বহু প্রকার শক্তি যোগে আমাদিগের কাম্য বস্তু বিধান করিয়া থাকেন।

ঈশ্বর আমাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির নিমিত্ত যে সকল উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাহা যথোপযুক্ত রূপে অবলম্বন করা আমাদিগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা কোন একটী পদার্থকে লঘু জ্ঞান করিতে পারি না, কোন একটী ঘটনাকেও সামান্য মনে করিতে পারি না; মনুষ্যের ভাব ও চরিত্র হইতে যে সকল জ্ঞান লাভ হইতে পারে তাহাতেও অবহেলা করিতে পারি না। আমাদিগকে সকলই দেখিতে হইবে, সকলই শুনিতে হইবে—সকল হইতেই শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে সকল অপেক্ষা গুরুই প্রধান উপায় রূপে পরিগণিত হন। আজ আমরা যে সকল জ্ঞান বা ধর্ম্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মনুষ্য বংশের প্রারম্ভাবধি প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইয়া এক্ষণে ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। সেই সকল জ্ঞান এক ব্যক্তির নিকট আর এক ব্যক্তি শিক্ষা করিয়াছে, তাহার নিকট আবার আর এক ব্যক্তি শিখিয়াছে, এবং এই রূপে কালপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া বহুকালের উদ্ভাবিত সত্য সকল আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এখন একটী বালককে যদি সমুদায় সত্য—সমুদায় জ্ঞান আপনাপনি চিন্তা ও আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার জীবনে অতি অল্প মাত্র জ্ঞান ও ধর্ম্মের সঞ্চয় হইবে। ঈশ্বর সে অভাব পরিপূরণের উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি আত্মাকে এমন প্রকৃতি-সম্পন্ন করিয়া সৃজন করিয়াছেন যে যথাতথা হইতে জ্ঞানের আভাস মাত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহার জ্ঞান সঙ্কুক্ষিত হইয়া থাকে। এই জন্য সকল দেশে ও সকল কালে এক এক ব্যক্তি

আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মার নিকট জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মও এই জন্য উপদেশ করেন,— "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।"

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে উপদেশের বিষয় কি কি এবং কি রূপ ব্যক্তি উপদেষ্টা হইতে পারেন।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বলেন, "স বিদ্বান্" সেই যে বিদ্বান্ গুরু, তিনি, "সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং" তিনি অভ্যাগত বিদ্যার্থী শিষ্যকে যথার্থ রূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবেন। এই রূপ ব্রাহ্মধর্ম্মেই পাওয়া যায় যে ব্রহ্মবিদ্যাই ব্রহ্মোপদেশের মুখ্য বিষয়।

এক্ষণে ব্রহ্ম বিদ্যা কি রূপ তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথমেই আছে যে "ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে। সকলেরই আত্মাতে ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে।" ইহা সত্য, কিন্তু ঐ স্বর্গীয় অগ্নির সত্তা মাত্রই কি মনুষ্যের ধর্ম্মের নিদান? না তাহা নহে, উহা প্রজ্বলিত হওয়া আবশ্যক। ঐ জ্ঞানের প্রজ্ব-লিত ভাবকেই ব্রহ্মবিদ্যা কহে। কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন সম্বৃত থাকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষের অবয়ব যেমন অনুদ্ভূত থাকে, সকল লোকের মনে ব্রহ্মজ্ঞান সেই রূপ সম্বৃত, অব্যক্ত বা মুকুলিতা-বস্থায় থাকে, তাহাই পরিস্ফুট হইয়া ব্রহ্ম বিদ্যা রূপে পরিণত হয়। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা আরো সুব্যক্ত হইতে পারে। বালকেরা প্রথমতঃ অঙ্কবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না। তাহারা কতকগুলি অঙ্কমালা অভ্যাস করিয়াই নিরস্ত থাকে। ইহা তাহাদের অঙ্কজ্ঞানের মুকুলিতাবস্থা। তখন তাহারা তাহাদের সহজ জ্ঞান প্রভাবে কতক কতক গণিতসম্বন্ধীয় প্রশ্ন সমাধা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কি করিতেছে তাহা তাহারা জানে না। পরে যখন তাহাদের সেই জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহারা অঙ্কের সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ ব্যাপক নিয়ম সকল অবগত

হয়। তখনই তাহাদের অঙ্কজ্ঞানকে অঙ্কবিদ্যা শব্দে উক্ত করা যাইতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞানও এই রূপ পরিস্ফুট অবস্থায় ব্রহ্ম বিদ্যা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম বিষয়ক উপদেশ দিবার অধিকারী নির্ণয় করিতে হইলেও এই রূপ বলা যাইতে পারে যে যেমন অঙ্ক জ্ঞানের মুকুলিতাবস্থায় বালকগণ অন্যকে অঙ্ক বিষয়ক কোন সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিতে পারে না, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানের মুকুলিতাবস্থাতে কোন ব্যক্তি যে অন্যকে ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দেন, তাঁহার এরূপ সামর্থ্য জন্মে না, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে গুরু যিনি "স বিদ্বান্" তিনি বিদ্বান্। তাঁহার মনে ব্রহ্মজ্ঞান মুকুলিতাবস্থা পরিহার করিয়া পরিস্ফুট অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্রহ্ম বিদ্যাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক—ব্রহ্মপ্রীতি বিষয়ক—ব্রহ্মনিষ্ঠা বা তাঁহার প্রিয় কার্য্য বিষয়ক।

প্রথমতঃ ব্রহ্ম জ্ঞান বিষয়ে কথিত হইতেছে। প্রথম অবস্থায় লোকে ঈশ্বরের যথার্থ তত্ত্ব কিছুই অনুধাবন করিয়া দেখে না। তখন সে যাতে তাতে ঈশ্বরের আরোপ করে, যে সে বিষয় ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্য বোধ করে এবং এই রূপে আপনার অপরিস্ফুট জ্ঞানের ক্ষুধা যে সে প্রকারে শান্তি করিয়া নিরস্ত হয়। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান পরিস্ফুটাবস্থা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য পরব্রহ্ম তত্ত্বের সার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। সে এই রূপে তাঁহার তত্ত্ব করিতে থাকে—ঈশ্বর সকলের আদি অতএব অনাদি, তিনি সকল অন্তবৎ পদার্থের সৃজন কর্ত্তা অতএব অনন্ত। তাঁহার জ্ঞানেতে সীমা নাই, শক্তিতে সীমা নাই, মঙ্গল ভাবে সীমা নাই,—তাঁহার দেশেতে সীমা নাই কালেতেও সীমা নাই। তিনি নিরাকার ও নির্ব্বিকার, তিনি অগম্য ও অগোচর। ব্রহ্মবিদ্গণ এই রূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। যাঁহাদিগের ব্রহ্ম জ্ঞান মুকুলিতাবস্থায় রহিয়াছে, তাঁহারা যাহাকে শূন্য মনে করেন, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ধীরেরা তাহাকেই পূর্ণ বলিয়া

জানেন। তাঁহারা যাহাকে কিছুই নয় বলেন, ব্রহ্মবিদেরা তাহাকে সারাৎসার বলিয়া প্রতীতি করেন।

এস্থলে আর দুইটী সমালোচনীয় বিষয় উপস্থিত হইতেছে।

প্রথমতঃ। অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঈশ্বর নিরাকার নির্ব্বিকার অনাদি ও অনন্ত এই সকল বাক্য কেবল শূন্য বা অভাব বোধক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত কিন্তু তাহা প্রজ্ঞার বিধাস। আমাদের বুদ্ধিতে ঈশ্বরের ঐ সকল স্বরূপ যে অভাব সূচক বোধ হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির নিজেরই অভাব সূচক, লক্ষিত বিষয়ের অভাব সূচক নহে। এই কথা ব্রাহ্মধর্ম্ম আরো এই রূপে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"। মন এবং বাক্য দুই তাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আইসে। ইহা এজন্য নহে যে ঈশ্বরের কিছুই নাই, আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারি না, পরন্তু তাহা এই জন্য যে ঈশ্বরের ভাব এমন স্থির, এমন গম্ভীর ও এমন মহান্ যে আমরা তাহা জানিতে ও বলিতে সমর্থ হই না, কেবলই স্তব্ধ হইয়া থাকি।

দ্বিতীয়তঃ। ঐ সকল বাক্য যেমন অভাবাত্মক নয় তেমনি আবার আমাদের ধর্ম্ম সাধনের অনুপযোগীও নয়। প্রত্যুত উহা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভের, উপদেশ এবং অনুষ্ঠানের অনতিক্রমণীয় বেলা ভূমি স্বরূপ। আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলি, মাতা বলি, বন্ধু বলি, সখা বলি,—কিন্তু সকল বাক্যই আমাদের প্রলাপোক্তি হইয়া যায়, যদি তত্ত্বজ্ঞান রূপ বেলা ভূমি আমাদিগকে নিয়মিত করিয়া না রাখে। ঈশ্বর বিশ্বের অতীত অথচ তিনি পিতা, তিনি অচিন্ত্য অথচ তিনি চিন্তনীয়, তিনি সকলের অগম্য অথচ তিনি আমাদের হৃদয়ের সখা, তিনি মহান্ অথচ তিনি আমাদের আত্মার ধন। তাঁহাকে জানা যায় না এমনও নহে, জানা যায় এমনও নহে। আমাদের পূর্ব্বতন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, যে "যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণোরূপং।"

অর্থাৎ যদি মনে কর যে সুন্দর রূপে জানিয়াছি তবে ব্রহ্মের স্বরূপ তুমি অল্পই জানিয়াছ।

এই রূপে দেখা যাইতেছে যে ঈশ্বরের অভাবাত্মক উপাধি দ্বারা আমরা যেমন আপন বুদ্ধির পরাভব উপলব্ধি করি তেমনি ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও পূর্ণত্ব প্রতীতি করিতে সমর্থ হই।

ব্রহ্মবিদ্যার দ্বিতীয় বিষয়, ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি। প্রীতি নিষ্কাম। প্রীতির সহিত নিষ্কাম ভাব জড়িত রহিয়াছে। ব্রহ্ম জ্ঞানের মুকুলিতাবস্থায় লোক এই নিষ্কাম প্রীতির স্বাদ গ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্ম জ্ঞানের পরিস্ফুট অবস্থায় এই নিষ্কাম প্রীতির উদ্ভব হয়।

অসীম প্রভৃতি শব্দের ন্যায় নিষ্কাম শব্দ শুনিতে অভাব-বোধক হয় কিন্তু উহা বাস্তবিক ঐ অসীমাদি শব্দের ন্যায় ভাবাধিক্যেরই বোধক। আমরা যাহাকে নিষ্কাম বলি—নিস্বার্থ বলি, তাহা জীবের প্রতি লক্ষ্য করিলে নিঃস্বার্থ কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহাই পরমার্থ। অসীম ও পূর্ণ এই দুই শব্দের যেমন একই অর্থ, নিঃস্বার্থ ও পরমার্থ এ দুই শব্দেরও সেই রূপ একই অর্থ। নিঃস্বার্থ ভাবে আত্মাতে যে প্রীতির উদ্ভব হয় তাহাই যথার্থ ঈশ্বরপ্রীতি।

এই প্রীতি দ্বারাই আমরা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হই।

নিষ্কাম প্রীতি দ্বারা আত্মাতে অসীম বল ও অক্ষয় আনন্দের সঞ্চয় হয়। এবং ঈশ্বরের প্রসাদে ক্রমশঃ তাহাতেই তাহার চরিতার্থতা এবং মুক্তি সাধিত হয়।

ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় বিষয় ব্রহ্মনিষ্ঠা বা তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন।

ব্রহ্মবাদিরা বলেন কেবল ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি করিলেই ব্রহ্মোপাসনা হয় না। যেমন তাঁহাকে প্রীতি করিবে, তেমনি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কি? তাহা আর কিছু নহে, যাহাতে জগ-

তের মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার প্রিয়কার্য্য। আমাদের শরীর পালন ও সংসার পালন,—সমাজের উন্নতি ও দেশের উন্নতি, এই সকল তাঁহার প্রিয়কার্য্য। ব্রহ্ম বিদেরা এই সকল কার্য্যকে তাঁহাদের নিজের কার্য্য বলিয়া সম্পান্ন করেন না, তাহা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করেন।

ব্রহ্মবিদ্‌দিগের নিষ্কাম প্রীতি ঈশ্বরের প্রতি অর্পিত হইলে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন নিমিত্ত আবার তাহা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আইসে। এই রূপ করিয়া মনুষ্যের যে প্রীতি বা অনুরাগ সংসারের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি। তাহাতে কিছু-মাত্র দোষস্পর্শের সম্ভাবনা থাকে না। সেই প্রীতিই মনুষ্য সমাজের সকল মঙ্গলের নিদান ভূত।

সেই পূর্ণ পরাৎপর পরমাত্মা সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ বিদ্যমান রহিয়া-ছেন। তাঁহার করুণার অন্ত নাই মহিমার পার নাই।

তিনি এক এবং বর্ণ হীন,তিনি একাকী এই সমস্ত জগতের তাবৎ প্রাণীর সমুদায় প্রয়োজন পূর্ণ করিতেছেন, তিনি সহস্র প্রকারে আমাদের জ্ঞানপিপাসা ও ধর্ম্ম তৃষ্ণা চরিতার্থ করিয়া আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছেন—সেই পরম দেবতা আমা-দিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করুন।

দ্বিতীয় উপদেশ।

২ মাঘ শুক্রবার ১৭৯১ শক।

"তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।"

"সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।" মনুষ্যের এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা। শরীর যে পৃথিবীর বস্তুতে নির্ম্মিত হইয়াছে, কিছুকাল পরেই সেই পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে; কিন্তু তাহার গর্ভে যে আত্মা প্রতিপালিত হইতেছে, সে অনন্ত কাল বিদ্যমান থাকিয়া লোক লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিবে।

এই আত্মা শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে, কিন্তু শরীর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যেমন আমি এই গৃহ হইতে সংপুর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিতেছি, সেই রূপ আত্মা বিভিন্ন-প্রকৃতি শরীররূপ নিকেতনে ঈশ্বরের আজ্ঞায় অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীর সহিত কথোপকথন করিতেছে; এই আত্মাই আমি। আত্মা এই শরীরে বর্ত্তমান আছে, কিন্তু শরীরের সর্ব্বাংশের সহিত তাহার সাক্ষাৎ যোগ নাই; শরীরের অংশবিশেষ যে মস্তিষ্ক; কেবল তাহারই সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ। সেই মস্তিষ্ক আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ সহকারে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিভ আত্মার সম্বন্ধ সংঘটন করিয়া দিতেছে, এবং কেবল সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিতই এই বাহ্য জগতের সাক্ষাৎ যোগ দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ! আত্মা এই ভৌতিক জগৎ হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছে এবং কত প্রকার যন্ত্র সহকারে ইহার সহিত সম্মিলিত হইতেছে।

আত্মা যে শরীর হইতে ভিন্ন ও এই জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহা সকলেই বলিবেন, তাহাব সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ভিন্নতা স্পষ্ট রূপে অনুভব করানই অদ্যকার উদ্দেশ্য। যদি কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, যদি আপনাদের ধ্যানপথে জড় হইতে বিভিন্নপ্রকৃতি আত্মা অবভাসিত হইয়া থাকে, তবে ক্ষণকালের নিমিত্তে সমুদায় বিষয় হইতে চিন্তাকে পৃথক্ করিয়া আপনাতে নিয়োজিত করুন। আমি যদি হস্ত নই পদ নই, চক্ষু নই কর্ণ নই, শিরা নই মস্তিষ্ক নই, তবে আমি কি, একবার ধ্যান করিয়া দেখুন। কি দেখিতেছেন? যেমন জড় বস্তুকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা জড় বস্তুর প্রতিকৃতি কল্পনা সহকারে মনে মনে ধ্যান করা যায়, আত্মাকে সে রূপ করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় নাই। আমরা জড় বস্তুকেও স্বরূপতঃ গ্রহণ করিতে পারি না, ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল জড়ের গুণ সকল প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু সেই সমস্ত গুণের আধারস্বরূপ বস্তুকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না; আত্মাকেও আমরা স্বরূপতঃ

গ্রহণ করিতে পারি না, কেবল আত্মার গুণ সমস্ত মানস প্রত্যক্ষের গোচর হয়। দেখ! আমরা আপনাকে আপনি স্বরূপতঃ জানি না। অতএব আপনাকে সেরূপ করিয়া গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন; আমি সমুদায় জড় হইতে পৃথক্ এবং জ্ঞান প্রাণ ভাব শক্তি সমন্বিত আত্মা—আমি চক্ষু নই, কিন্তু আমি চক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া থাকি; আমি হস্ত নই, কিন্তু হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি; আমি বাহিরের কোন বিষয় নই, কিন্তু আমি বিষয়ের দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা ও মন্তা; আমরা এই রূপ আপনাকে জানিতে অধিকারী হইয়াছি।

আপনার বিষয় আরও কিছু অধিক জানিতে পারিয়াছি—কিছু দিন পূর্ব্বে আমি কিছুই ছিলাম না; আপনার ইচ্ছাতেও এই পৃথিবীতে সমাগত হই নাই; ভূমিষ্ঠ হইবার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান অপরিস্ফুটিত ছিল। আমি জড় বস্তু অপেক্ষা আপনাকে অনেক শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, কিন্তু আমার যে ক্ষুদ্রতা তাহাও পদে পদে অনুভব করিয়া থাকি। আমার সমুদায় শক্তিই পরিমিত; আমি অনেক বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াও জানিতে পারি না, অনেক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াও করিতে পারি না। আমাকে এই সমস্ত ভৌতিক পদার্থের অধীন হইয়া চলিতে হয়, আমাকে শরীরের অধীন হইয়া চলিতে হয়; আমি বহু যত্ন করিলেও এক বারে এই সমস্ত পদার্থকে অতিক্রম করিতে পারি না। এই শরীরের সহিত এরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া আছি যে, শরীরের ক্লেশে আমি ক্লিষ্ট হইয়া পড়ি, এবং আমার স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত এই শরীরের স্বচ্ছন্দতার উপর আমাকে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। চতুর্দ্দিকে যে সকল ভৌতিক পদার্থে বেষ্টিত হইয়া আছি, তাহার নিকটে আমার শক্তি ক্ষণে ক্ষণে পরাভূত হইতেছে। এই রূপে আপনাকে পরতন্ত্র বলিয়া পদে পদেই অনুভব করিতেছি। কিন্তু ইহাও জানিতেছি যে, এই বর্ত্তমান অবস্থা আমার তৃপ্তিকর নহে। আমার আশা ও কামনা এক অলক্ষ্য অবস্থার দিকে আমাকে

অনবরত উৎসারিত করিতেছে। সে অবস্থা কি তাহা স্পষ্ট রূপে জানি না, কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এই বর্ত্তমান অবস্থা সে অবস্থা নহে। আপনাতে এরূপ কতকগুলি উপকরণ দেখিতে পাই যে, তাহারই সাহায্যে আপনাকে পরিচালিত করিতে হইবে। কতকগুলি এরূপ ভাবও দেখিতে পাই যে, তাহা কেবল এই পৃথিবীতেই অবস্থান করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। আরও গভীর রূপে আপনাকে লইয়া আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, আমাদের জীবনের স্রোত অনন্ত কালের সঙ্গে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার শেষ নাই। পৃথিবী আমাদের চিরনিবাস নহে; এখানকার কমলায় দুই দিনের জন্য; এখানকার সম্পাদ্ বিপদ্, স্তুতি নিন্দা, ও মান অপমান কিছুই আমার চিরসঙ্গী নহে। অনেক বন্ধু যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমি আবার সেই রূপ অনেক বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, কিন্তু আমার ধ্বংস নাই।

এই রূপ আত্মবোধ জাগরিত থাকিলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যখনই আত্মবোধ দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তখনই আমাদের হীনাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন কেবল পশুর ন্যায় বহির্বিষয়ের অধীন হইয়া জীবন ধারণ করি, জীবন লাভের মহান্ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া যাই, এই মর্ত্তালোকই সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে, এখানকার সুখ সম্পাদই পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এখানকার দুঃখ বিপদেই মৃত্যু ভাবিয়া কম্পিত হইতে থাকি। কিসের জন্য মনুষ্য পুণ্য পথ পরিত্যাগ করিয়া পাপানলে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করে? কিসের জন্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে আসক্ত হয়? কিসের জন্য ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচার করে? কিসের জন্য ধূর্ত্ততা, প্রতারণা, নরহত্যা অনুষ্ঠিত হইতেছে? কিসের জন্য ব্যভিচার, মদমত্ততা, কুৎসিত আমোদ প্রভৃতি পিশাচবৃত্তি সকল জনসমাজকে আকুল করিয়া তুলিতেছে? আত্মবোধের অভাব— আত্মা কি মহৎ উদ্দেশে এখানে প্রেরিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে ইহার

কি অবস্থা হইবে, এই জ্ঞানের দুর্ব্বলতাই কি এই সকল অনর্থ-পাতের হেতুভূত নহে? আবার জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কিসের জন্য এই ব্রাহ্মসমাজে সমাগত হইয়াছেন? কিসের জন্য কাতর হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন? কিসের জন্য সাধু সঙ্গ অন্বেষণ করেন? কিসের জন্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্রের প্রণয়পাশ ছেদন করিয়াও পুণ্যরত্ন উপার্জ্জনে ধাবমান হন? অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হন? আত্মা কি যত্নের ধন, তাহা বুঝিতে পারাই কি ইহার কারণ নহে? ব্রাহ্মগণ! এখনও আমরা আপনার বিষয় অধিক করিয়া আলোচনা করিতে অভ্যাস করি নাই; এখনও আত্মাকে নিষ্কলঙ্ক রাখিবার জন্য প্রাণের সহিত যত্ন করিতে শিখি নাই; এখনও সময়ে সময়ে পশু ভাবের নিকট আত্মাকে বলিদান করিয়া থাকি; এখনও আমরা ঈশ্বরভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা ও লোকহিতৈষণা প্রভৃতি আত্মসম্পদ্ সমস্ত যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিতে শিখি নাই; এখনও আত্মদোষ পদে পদে ক্ষমা করিয়া থাকি; এই সমস্ত ব্যবহার আত্মবোধের ক্ষীণতা হইতে উৎপন্ন হয়। সাবধান! যদি এই ক্ষীণতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তবে নিশ্চয়ই পতন, নিশ্চয়ই পতন। আপনাকে অহরহঃ নিয়মিত রূপে পর্য্যবেক্ষণ না করিলেই আত্ম-বোধ ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে।

আত্মদৃষ্টি প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির ইচ্ছা জাগরিত হয়; আত্মা সমুদায় ক্ষীণতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে। বর্ত্তমান অবস্থা বস্তুতঃই তৃপ্তিকর নহে, এখনও উন্নতির যথেষ্ট প্রয়োজন। আপনাকে জানিতে পারিলেই এই রূপ অভাব অনুভূত হয় এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঔৎসুক্য জন্মে। মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হইলে এই সকল অতৃপ্তিকর অবস্থা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধভাগে উত্থিত হইবার জন্য সমুদায় আত্মা ব্যাকুল হইতে থাকে। বিষয় বিভব মান সম্ভ্রম আমাদের বাহ্য সম্পদ, কেবল পৃথিবীতে সুখী হইবার জন্যই ঐ সমস্ত সম্পদের প্রয়োজন; কিন্তু জ্ঞান প্রেম

ন্যায় ধর্ম্ম আমাদের আত্মসম্পদ্, অনন্ত জীবন আমাদিগকে দারিদ্র্য দুঃখ হইতে মুক্ত রাখিবার উপায়। ঈশ্বরের পবিত্র নিয়মানুসারে আমার বাহ্য সম্পদ্ বর্দ্ধিত হয়, হউক, বিনষ্ট হয় হউক; তাহার সুখ ও দুঃখ দূরদর্শীর চক্ষুতে তাদৃশ মূল্যবান্ নহে; তদ্বিষয়ে আমার যখন যে অবস্থা ঘটুক, নীতিজ্ঞদিগের উপদেশ অনুসারে আমি সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করিব; কিন্তু আত্মসম্পদের কত দূর সংস্থান হইল, আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য দুঃখ হইতে কত দূর মুক্তি লাভ করিয়াছি, তাহা গণনা করিয়া দেখিলে হৃদয় আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। বস্তুতঃ আত্মার বর্ত্তমান অবস্থা কোন প্রকারেই তৃপ্তিকর নহে। যখন আপনার অন্তরে দৃষ্টিপাত করি, তখন আমোদ প্রমোদ সুখ সন্তোষ কোথায় পলায়ন করে! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, মনুষ্যের ভয়ে তাহা আবৃত করিয়া ভদ্রসমাজে দণ্ডায়মান হইলাম, মনুষ্যের চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করিলাম, কিন্তু অন্তর্জ্জ্বালা কেবল সেই সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরই দেখিতেছেন। এই জন্য আত্ম-জ্ঞান পরিস্ফুটিত হইলেই মুক্তির ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে।

সেই আত্মবুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বরকে ধন্য বাদ করি—যিনি মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে আত্মবোধ প্রদান করিয়াছেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি। তাঁহার করুণার সীমা নাই, তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য কোন উপায় বিধান করিতে অবশিষ্ট রাখেন নাই; কেবল আমরা দুর্বুদ্ধি বশতঃ তাহাতে অবহেলা করিয়া আত্মঘাতী হইতেছি। "ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ। যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সেই আত্মঘাতী হয়।"

আপনাকে দেখিলে নিশ্চয়ই বোধ হইবে, আমাদিগের চতুর্দ্দিকেই অভাব, বর্ত্তমান অবস্থা কোন রূপেই তৃপ্তিকর নহে; কিন্তু কি উপায়ে ইহা হইতে মুক্তিলাভ হইবে? মনুষ্যের নিকট মুক্তির আশা নাই; মুক্তির কথা দূরে থাকুক, তুমি মনুষ্যের নিকট হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন কর, সে নিষ্ঠুর হইয়া তাহাতে পদাঘাত করিবে।

কৈ এমন ক্ষমাগুণ কোথা যে, আমি দগ্ধ হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দিলে ঘৃণাভরে বিকটবদন না হইয়া সহিষ্ণুতা সহকারে শীতল বারি বর্ষণ করিতে পারে? মনুষ্য পদে পদে তোমাকে অপবিত্র ভাবিয়া পরিত্যাগ করিতেছে, সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতেছে, গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিতেছে। হা! অপরাধবিশেষে তোমাকে পৃথিবীতে রাখিবার অযোগ্য ভাবিয়া তোমার প্রাণ দণ্ড করিতেছে। মনুষ্য যখন তোমার সংসর্গ সহ্য করিতে পারে না, তখন তাহার নিকট তোমার আর কি প্রত্যাশা রহিল? হউক, এমন ক্ষমাশীল মনুষ্য আছেন, আমি স্বীকার করিলাম, এখন জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের সে শক্তি কোথা? মনুষ্য কি মুক্তি দান করিতে পারে?

তবে মুক্তির জন্য কাহার শরণাপন্ন হইব? সন্তান যখন বসন্তরোগে আক্রান্ত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত পূযে বীভৎস হইয়া উঠিল, কেহই তাহার ত্রিসীমায় পদার্পণ করে না; তখন পুত্রবৎসলা জননী তাহার আর্ত্তনাদে অস্থির হইয়া আপনার পবিত্র বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন, সেই দুর্গন্ধ অপবিত্র শরীর অম্লান বদনে আপনার পবিত্র বক্ষঃস্থলে তুলিয়া লইলেন; কহিলেন, "বাছা! তোমার সব যন্ত্রণা আমার শরীরে দাও।" আমাদের কি তেমন জননী নাই? এই পাপ তাপ শোক দুঃখে ক্ষত বিক্ষত আত্মাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রতিপালন করিবার কেহই নাই, এই দারিদ্র্য দুঃখে নির্ভর নিপীড়িত আত্মা একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয় এমন দ্বার নাই? হে আত্মন্ কেন আত্মবিস্মৃত হইতেছ? তুমি যদ্দ্বারা আপনার দুরবস্থা অবগত হইয়া মুক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছ, কে তোমাকে এই আত্মবোধ প্রদান করিয়াছেন? যে প্রস্রবণ হইতে স্নেহরস নিঃসৃত হইয়া জননীর হৃদয় পুত্রবৎসল করিয়াছে, তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তিনি ক্ষমাময়, যদি সমুদায় হৃদয় অপবিত্রতায় মলিন হইয়া থাকে, তাঁহার নিকট উন্মোচন কর, তিনি কখনই ঘৃণা করিয়া দূর করিয়া দিবেন না; যাহা কিছু অভাব, তাঁহার নিকট ব্যক্ত কর, তিনি

তাহা মোচন করিয়া দিবেন; আপনার সমুদায় অভাব জানিয়া তাঁহার নিকট নিবেদন করিব বলিয়া তিনি আত্মবোধ প্রদান করিয়াছেন। আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই।

পিতা! মাতা! মুক্তির জন্য তোমার নিকট দণ্ডায়মান হইয়াছি, তুমি যদি পরিত্যাগ কর, তবে ত্রিসংসারে আর আশ্রয় নাই। তোমার অসীম ক্ষমাই আমাদের ভরসা; তোমার অসীম স্নেহই আমাদের নির্ভর স্থান। তোমার প্রসাদে আত্মবোধ লাভ করিয়া আপনার দুরবস্থা জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু মুক্তিদাতা! তোমা ভিন্ন কে তাহা হইতে মুক্তি দান করিবে। হে অন্তর্যামী! তুমি কি না জানিতেছ। তোমাকে আর কি বলিব। হে দেব! হে পিতা! আমাদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর, যাহা কল্যাণ তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর।

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দু্রিতানি পরাসুব যদ্ ভদ্রং তন্ন আসুব।'

তৃতীয় উপদেশ।

৩ মাঘ শনিবার ১৭৯১ শক।

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥"

"অল্পবুদ্ধি লোক সকল বহির্ব্বিষয়েতেই আসক্ত হইয়া মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে আবদ্ধ হয়, ধীর ব্যক্তিরা ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিয়া সংসারের তাবৎ অনিত্য পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।"

জগদীশ্বর দয়া করিয়া আমাদের এমনি প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন, যে যদি আমরা তাঁহার শরণাপন্ন হই, তিনি আত্মাতে যে মধুময় উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা শ্রবণ করি ও তাহার অনুগত হইয়া চলি, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে আমাদের আত্মা দিন দিন অমৃতময় কল্যাণময় পথে অগ্রসর হইতে থাকে, জীর্ণ মলিন কামনা

সকল পরিত্যাগ করে এবং স্বর্গীয় ভাব ও কামনায় বিভূষিত হইয়া তাঁহার মঙ্গল ও শান্তি রাজ্যে উপনীত হয়। আমরা যদি প্রাণ মন তাঁহাতে সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমাদের জীবন নবতর কল্যাণতর উপকরণে সংরচিত হয়, তখন তাহার লক্ষ্য মহান্ পবিত্র ও গম্ভীর হইয়া উঠে। ইতরজনমোহকর ক্ষুদ্র বিষয় তাহাকে আর আলোড়িত করিতে পারে না; যাহা ভদ্র, যাহা পবিত্র, যাহা আত্মার যথার্থ শান্তিপ্রদ, স্বাধীনভাবে, মুক্তভাবে তাহার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রীতি হয় ও তাহা সাধন করিতে এবং তাহার বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিতে প্রবল অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে। আত্মা প্রকৃতিস্থ থাকিলে সহজেই ধর্ম্মের অমৃতময় রসে পরিপূর্ণ হয়; বালকের ন্যায় বহির্বিষয়ের কামনাতেই পরিচালিত না হইয়া কেবল ধর্ম্মের আদেশেই ধর্ম্ম সাধন করে। আমাদের আত্মা যদি ঈশ্বর-প্রসাদে পরিশুদ্ধ ও সমুন্নত হয়, তাহা হইলে অচিরস্থায়ী খ্যাতি ও সম্মান লাভের প্রার্থী না হইয়া কেবল স্বীয় গভীর অভাব সম্পূরণের জন্যই ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে। ধীর ব্যক্তি লোকানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া একটীও ধর্ম্ম কার্য্য করেন না, একটীও ধর্ম্ম চিন্তা করেন না। তিনি সাধু কর্ম্ম করিলে সাধু লোকেরা যখন তাহার অনুমোদন করেন, তখন তাঁহার আহ্লাদ হয় বটে, কিন্তু নিন্দা ও প্রশংসার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া তিনি কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিতেই কার্য্য করেন। তিনি এখানকার সমুদয় বস্তু অপেক্ষা ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে সমধিক প্রীতি করেন। তিনি অনবরত প্রেম-পূরিত নয়নে সেই প্রেমাকরের প্রেম দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকেন। সেই প্রেমময়ের প্রেম আপনার অন্তরে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনাতে ও বহির্জ্জগতে দেখিয়া প্রফুল্ল হয়েন ও তাঁহার কার্য্য প্রেম ও উৎসাহ সহকারে সম্পাদন করিতে থাকেন। তিনি অত্যাশক্তি বিবর্জ্জিত হইয়া, প্রেমদাতার অনুমোদিত বলিয়াই সংসারের কার্য্য করেন, সুতরাং সংসারপাশ-যে-মৃত্যু-তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। তিনি যে-প্রেরণাতে প্রেরিত হইয়া ধর্ম্ম-চেষ্টা ও চিন্তা করেন, তাহার

কোন ফল প্রত্যাশা নাই। তিনি যখন পরোপকার বা কোন সামাজিক সংস্করণে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহা ধর্ম্মানুগত কর্ত্তব্য কি না, তাহাই দেখেন ও তাহা হইলেই তিনি আপনার অর্থ, সামর্থ্য সময় প্রভৃতি তাহাতে বিনিয়োজিত করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন। 'প্রত্যুপকার লোভ বা মানলিপ্সা তাঁহার অন্তঃকরণের পরিচালক হয় না।

পরমার্থ-রসে যাহাদের চিত্ত এখনো রসিত হয় নাই, তাহারা সামান্য বস্তুর প্রেমেতেই মুগ্ধ হয়; যাহা কিছুই নয়, তাহাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহার অনুশীলন, তাহার প্রতি অনুধাবন করিয়া তাহারা অমূল্য জীবন ক্ষেপণ করে, তাহাদের আশা ভরসা ইচ্ছা কামনা এই মর্ত্ত্য লোকেতেই আবদ্ধ। তাহাদের আত্মা এই সংসারের মোহঘনাবলী অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মের নির্ম্মল আকাশে বিচরণ করিতে পারে না। তাহাদের এক এক প্রবৃত্তি এক এক দুর্গতির হেতু—ধর্ম্ম রূপ আধ্যাত্মিক জীবন-পথের এক এক কন্টকস্বরূপ। যে মানৈষণা, যশোলিপ্সা দ্বারা তাহারা চালিত হয়, তাহা ধর্ম্মের নিয়ন্তা হইলে ধর্ম্ম কি নির্মূল্য, কি অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। এ পৃথিবীতে নাম কীর্ত্তি রাখিবার আশা কি দুরাশা! হে যশোলোলুপ মনুষ্য! মনুষ্যেরা তোমার যশঃ কীর্ত্তন করুক ইহাই তোমার ইচ্ছা, কিন্তু মনে করিয়া দেখ সেই সকল লোক তোমার যশঃস্পৃহারূপ লঘুচিত্ততা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমাকে উপহাস করিবে। তুমি আপনাকে দেখ, তোমার আত্মাই তোমাকে নিন্দা করিতেছে; কিন্তু কি মোহ! কি আশ্চর্য্য! তুমি অনবরত এই ইচ্ছা করিতেছ যে অন্যে তোমার যশোগান করুক। তুমি এমন কি কর্ম্ম করিয়াছ যাহাতে তুমি মনে করিতেছ যে তোমার নাম চিরকাল পৃথিবীতে জাগরূক থাকিবে? তুমি পৃথিবীর অল্প পরিমিত স্থানে বাস কর, তোমার নাম পৃথিবীর এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে ইহার সম্ভাবনা কি? আর যদিও তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়, কত

কাল তোমার নাম লোকমণ্ডলে বিরাজমান থাকিবে? এমন কাল অবশ্যই উপস্থিত হইবে যখন পৃথিবীতে তোমার যশোগাতা তোমার নাম ও গুণ জ্ঞাতা লোকের নিশ্চয়ই অভাব হইবে। আর যদিও চিরকাল তোমার নাম এই ধরাধামে বিদ্যমান থাকে, তোমার মৃত্যুর পর তাহার সহিত তোমার আর কি সম্বন্ধ থাকিবে? এই পৃথিবীর যাবতীয় সম্পত্তি এই পৃথিবীতেই থাকিবে, তুমি একাকী আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিবার নিমিত্ত কোন্ লোকে অপসারিত হইবে। অতএব যদি যশের জন্য ঈশ্বরকে পরিত্যাগ কর, তবে তোমাকে বালক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

যদি ঐহিক মানৈষণা দ্বারা তুমি প্রেরিত হও, তাহা হইলেও তোমর কি অনৌদার্য্য কি কপটতা প্রকাশ পাইতেছে। যাহারা তোমা অপেক্ষা হয় তো অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ, তোমার একটী কার্য্য দেখাইয়া তুমি তাহাদিগকে বিমোহিত করিতে চাও,কিন্তু এখনি যদি তাহারা তোমার চিত্তের অভ্যন্তর দেখিতে পায়,তাহা হইলে তাহারা কি তোমার সম্মাননা করিবে? হে মানব! তুমি আপনার আত্মাকে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুমি আপনি আপনাকে সম্মান করিতে সমর্থ হও কি না? তোমার অন্তরে কত জঘন্য ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে কি তোমার হৃৎকম্প হয় না? দেখ, তোমার মনই তোমাকে মৃত্যুর পাশে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে মানব! তুমি নীচ কামনা সকল পরিত্যাগ কর, যদি কোন মনুষ্য এখনি তোমর চিত্তের অভ্যন্তর দেখিতে পায় তাহা হইলে কি তুমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হও না? কিন্তু সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বর তোমার চিত্তের প্রত্যেক বৃত্তান্ত পাঠ করিতেছেন, তুমি মলিন কুটিল কামনা লইয়া তাঁহার নিকট কি প্রকারে যাইবে? তোমার হৃদয়ে যে সকল দুরভিসন্ধি দুরাশা দুশ্চিন্তা পোষিত আছে, তুমি তাহাদিগকে একবারে বিষবৎ বিসর্জ্জন কর। দেখ, তোমার জীবন বৃথা বহিয়া যাইতেছে, কুপ্রবৃত্তির করাল হস্ত হইতে এখনো তাহা উদ্ধার কর। তুমি ধর্ম্মবুদ্ধিতে

ধর্ম্ম সাধন কর, যশ ও মানের স্পৃহা রাখিও না। ধর্ম্মের পথ প্রথমে সঙ্কীর্ণ ও তিমিরাবৃত বোধ হয় বটে, কিন্তু মনুষ্য যতই তাহাতে প্রবেশ করে, ঈশ্বরপ্রসাদে তাহা ততই প্রশস্ত আলোকময় ও সুখকর হইয়া আইসে। মনুষ্য যদি চেষ্টা করে তবে আপনার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উপর অভাবনীয় অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। ধর্ম্ম-মঞ্চের যে স্থান অতি দূরবর্ত্তী ও দুর্গম বলিয়া বোধ হয়, ভক্তি ও সাধন প্রভাবে তাহা নিকট ও সুগম হইয়া উঠে।

হে মর্ত্ত্য মনুষ্য! ঐহিক মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর বিষয়ে তুমি এত লালায়িত কেন? বালকের ন্যায় ক্ষুদ্র বিষয়ে লালায়িত হইয়া কেন মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতেছ? তুমি এখানকার "চারি দিনের সুখের" জন্য কি আপনার অমৃত ধাম ভুলিয়া যাইবে? হে অমর জীব! তুমি এখানে কিছু দিনের জন্য আসিয়া আপনাকে কেন কলুষিত করিতেছ? তুমি আপনাতে সত্য সুন্দর মঙ্গল অমৃত বীজ বপন করিয়া তাহাতে যত্নবারি সেচন কর, তাহার ফল তুমি অনন্তকাল উপভোগ করিবে। অদ্যকার দিন ইহ জীবনের শেষ দিন জানিয়া সযত্নে আপন কর্ত্তব্য সাধ্যানুসারে সম্পন্ন কর। করুণাময় জগদীশ্বরের প্রতি স্থির নির্ভর করিয়া সংসারের কার্য্য কর। তাঁহার মঙ্গল-হস্ত সকল ঘটনাতেই দেখ। অমৃতের জন্য—ধর্ম্মের জন্য তোমার ক্ষুধা বর্দ্ধমানা হউক। প্রেমাকর জগৎপিতার নামে তোমার হৃদয় নয়ন বিগলিত হউক। তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে তোমার আনন্দ বর্দ্ধিত হউক। যে কোন দেশে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঈশ্বরের—ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তৃত হয়, তাহা যেন তোমার পরমাহ্লাদের কারণ হয়। সেই সুখ-রাজ্য বিস্তার-কারীর প্রতি ঈর্ষ্যা যেন ভ্রমেও তোমার মনে না হয়, আমার দ্বারা এ কার্য্যটি সমাহিত হইলে আমার কি যশোলাভ হইত, এ রূপ আক্ষেপ কোন ক্রমেই যেন তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়। বরং সেই শুভকারী ব্যক্তিকে প্রেম-ভরে সাহায্য করিতে, তাঁহাকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে যেন তোমার আন্তরিক ইচ্ছা জন্মে।

পরস্পার ভ্রাতৃ ভাবে মিলিত হও, বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলকেই প্রেম কর, তাহাদের দোষ লইয়া জল্পনাও আমোদ করিও না। তাহাদিগের উন্নতির জন্য, দুঃখ হ্রাস ও সুখ বৃদ্ধির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর, কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রীতিতে ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে এই সকল কার্য্য করিবে; প্রত্যুপকার বা মানের আশায় করিও না। এবং ঈশ্বরের এই বিচিত্র রাজ্যে কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত হইও না। যখন ঈশ্বর ও ধর্ম্মেতে তোমার আন্তরিক প্রীতি হইবে, যখন জীবন ধারণের মহান্ উদ্দেশ্য তোমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিবে, যখন লোকের নিন্দা বা স্তুতিতে তুমি বিচলিত হইবে না, যখন "হৃদয় দুয়ার" খুলিলেই তুমি অরূপী পরমেশ্বরের প্রসন্ন প্রেম-মুখ দেখিয়া অপার তৃপ্তি অনুভব করিবে, তখন তুমি অমৃতত্ব লাভ করিবে, তখন জীবন্মুক্ত হইয়া ইহ লোকেই তুমি স্বর্গ-সুখ উপভোগ করিবে।

হে পুণ্যের আকর প্রেমের ঈশ্বর! তুমি আমাদিগের মনে মঙ্গলের—প্রেমের উৎস সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে কি অপার সুখ ও শান্তি প্রদান করিতেছ? নাথ! যখন আমরা তোমার প্রেম অনুভব করি, তখন আমাদিগের নিকট নদ নদী সকল মধু বহন করে, সূর্য্য চন্দ্র তারা মধু ক্ষরণ করে, জগৎ মধুময় বোধ হয়, তখন তোমার প্রেম পিতা মাতার স্নেহে, ভার্য্যা বন্ধুর প্রণয়ে, জগতের প্রত্যেক শোভাতে, প্রত্যেক ঘটনাতে দেখিয়া পুলকিত হই— তখন তোমার প্রেমে প্রেমিক হইয়া আমাদিগের জীবন কি অভিনব মঙ্গল পথে ধাবিত হয়! তখন তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে আমাদিগের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু তুমি জান, কি মোহ কত বার আসিয়া আমাদিগের আত্মাকে অন্ধতমসাবৃত করিয়া দেয়, তাহাকে স্বার্থের দিকে লইয়া যায়। হে মোহনিরসন পাপনাশন পতিত পাবন! তুমি আমাদিগের পাপ তাপ বিদূরিত কর, আমাদিগকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ কর, ধর্ম্মের প্রতি যেন আমাদিগের নিঃস্বার্থ ও প্রাণগত যত্ন ও প্রেম

হয়। আমরা যখন পরোপকার প্রভৃতি মঙ্গল কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, তখন যেন মনে হয় যে আমরা মর্ত্ত্য জীব নহি; যেন তোমার বায়ু অগ্নি চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার জগতের মঙ্গল সাধন করিতেছি। লোকানুরাগ-প্রিয়তা যশোলিপ্সা যেন আমাদিগের বিঘ্নস্বরূপ না হয়। তুমি বল্মীক ও মধুমক্ষিকা দ্বারা জগতের কত কর্ম্ম করাইতেছ, কিন্তু বল্মীক ও মধুমক্ষিকা জানে না, তাহারা কাহার কর্ম্ম করিতেছে। আমরা যেন সেই রূপ অন্ধ প্রবৃত্তির দাস না হইয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক তোমার কর্ম্ম করি, আমরা যেন প্রেমচক্ষে তোমাকে নিয়ত দেখিতে পাই ও তোমার কার্য্য প্রেম ও উৎসাহ সহকারে করিতে থাকি। ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

চতুর্থ উপদেশ।

৪ মাঘ রবিবার ১৭৯১ শক।

"ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি।"

"এখানে থাকিয়াই আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি; যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম, তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা ইহাঁকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন; তদ্ভিন্ন আর সকলেই দুঃখ পায়।"

মনুষ্যের আকৃতি ও প্রকৃতির প্রতি বিশেষ রূপে প্রণিধান করিয়া দেখিলে তাহাকে সামান্যতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। এক ভাগ কেবল জড় পদার্থের সমুদায় লক্ষণাক্রান্ত; অপর ভাগ সে প্রকার নহে, তাহার লক্ষণ জড় পদার্থের গুণ সমুদায়ের অতীত এবং তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্তু মনুষ্য-

জীবনে তাহা জড় পদার্থকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহার নাম জীবাত্মা ; সাধারণতঃ আত্মাও বলা যায়। আত্মার প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টি করিলে তাহার যে সমস্ত গুণ দেখা যায়, তৎসমুদায় বিবিধ প্রকরণ অনুসারে বিভাগ করিলে দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই দুইটী শ্রেণী পুনরায় চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রস্তাবে আমরা ঐ সমস্ত লক্ষণকে কেবল দুই প্রধান শ্রেণীভুক্ত গণ্য করিলেই যথেষ্ট হইবে, এ নিমিত্ত আত্মার সমুদায় গুণকে মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত গণ্য করা গেল। এই প্রকার বিভাগের পর মনুষ্যের বৃত্তি ও প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে সেই সকলকে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক এই তিন ভাগে বিভক্ত দেখা যায় ; তন্মধ্যে আমাদের মনোবৃত্তি সকল শারীরিক বৃত্তি সমুদায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং আধ্যাত্মিক গুণসমূহ সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। এই নিমিত্ত শরীর নাশে আমরা যত দূর ক্ষতিগ্রস্ত হইব, মনের বিনাশ হইলে আমরা তদপেক্ষা অনেক গুণে, অধিকতর রূপে ক্লিস্ট হইব, কিন্তু আত্মার নাশে যে দুঃখ তাহার সহিত কোন প্রকার ক্লেশের তুলনা হইতে পারে না। "আত্মার নাশ" হয় তো এই বাক্য শ্রবণ মাত্র অনেকে চমকিত হইতেছেন, আত্মা অবিনশ্বর অনন্ত, তাহার আবার নাশ কি ? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অতি সহজেই প্রাপ্ত হই। কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, আত্মার অধোগতি অথবা আধ্যাত্মিক সমুদায় বৃত্তি নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাওয়াই আত্মার নাশ। জীবন এক কালে বিনষ্ট হইলে তত ক্ষতি নাই, কিন্তু জীবিতাবস্থাতে যদি সমুদায় অঙ্গ এক কালে পঙ্গু হইয়া যায়, হস্ত পদাদি চালনা করিবার কিছুমাত্র শক্তি না থাকে তাহা অপেক্ষা ক্লেশ আর কি আছে ? মৃত্যুযন্ত্রণা সহস্র বার সহ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রকার অবস্থায় মুহূর্ত্ত মাত্রও

জীবিত থাকাতে যে যাতনা, তাহার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না; মৃত্যুতে যদি কিছুমাত্র যন্ত্রণা থাকে অথবা যতই যন্ত্রণা থাকুক না কেন, তাহা এক বারের নিমিত্ত, কিন্তু এরূপ অবস্থাতে প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; বিশেষ, শরীরে যে রোগ আছে অথবা ক্লেশ পাইতেছি ইহা অনুভব করিবারও শক্তি না থাকাতে এই অবস্থাকে যে কত দুঃখের অবস্থা মনে করা কর্ত্তব্য তাহা ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। সেই রূপ, আত্মার একে বারে নির্ব্বাণ হইতে পারে যদি ইহা অনুভব করিতে পারিতাম তাহা হইলেও হয় তো তত ক্লেশ বোধ হইত না, কিন্তু যে কালে আত্মা একে বারে অসাড় হইয়া পড়ে, হিতাহিত কিছুই জ্ঞান থাকে না, স্বকীয় বল ও স্বাধীনতার এমন হ্রাস হয় যে কেবল প্রবৃত্তির দাস হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয় সমুদায় যে দিকে লওয়ায় সেই দিকেই গমন করে এবং ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, সে অবস্থা কি শোচনীয়? তাহাই আত্মার প্রকৃত নাশ, অতএব আত্মার যে এই প্রকার নাশ, তাহাই আমাদের "মহাবিনাশ।"

আত্মার এই মহাবিনাশের কারণ কি, এবং এই মহৎ রোগের কোন ঔষধ আছে কি না? আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে "যদি আমরা তাঁহাকে না জানিতাম তবে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইতাম" যদি আমরা ঈশ্বরকে না জানি তাহা হইলে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হই। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, ঈশ্বরই আত্মার জীবন। যেমন জীবাত্মা হইতে শরীর পৃথক হইলে দেহের নাশ হয়, সেই রূপ পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা বিচ্যুত হইলে জীবাত্মার নাশ হয়; জীবাত্মার নাশই আমাদিগের মহাবিনাশ। আত্মা ঈশ্বর-শূন্য হইলে যে কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে সেই দুরবস্থার সহিত আর কোন প্রকার দুঃখের তুলনা হয় না। আত্মাকে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত করিলে ধর্ম্মভাব আর কিছুমাত্র থাকে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম

সমুদায়ই এক হইয়া যায়, যথেচ্ছাচারিতাই আমাদের সকল কার্য্যের মূল হইয়া পড়ে, এরূপ জঘন্য কোন কার্য্যই থাকে না যে, তাহা ঈশ্বরশূন্য আত্মা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতে না পারে। আমরা হয় তো মনে করিতে পারি যে,অনেক ব্যক্তিকে এরূপ দেখা গিয়াছে যে তাঁহারা ঈশ্বরে কিছুমাত্র বিশ্বাস করেন না, অথচ কার্য্যতঃ অধর্ম্মাচরণ কিছুই করিতেছেন না; ইহা সত্য হইলেও ঈশ্বরশূন্য হওয়াতে এই সমস্ত ব্যক্তিদিগকে চিরকাল ধর্ম্মপথে স্থির রাখিতে পারে তাহার প্রতিভূস্বরূপ ধর্ম্মগ্রন্থি কিছুই নাই; অনাবশ্যক বিবেচনায় অথবা প্রলোভনের বলের নিতান্ত আধিক্য না থাকায় তাঁহারা এক্ষণে যে সকল অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত আছেন— যখন সংসারের প্রলোভন নিতান্ত প্রবল হইয়া উঠিবে অথবা কোন উদ্দেশ্যবিশেষ সংসাধনের নিমিত্ত সেই সমস্ত কার্য্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে, তখনও তাঁহারা যে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই; যাঁহারা কোন মতে আপন দায়িত্ব স্বীকার না করেন, তাঁহারা কি নিমিত্তেই বা ঐ সকল কার্য্য ত্যাগ করিবেন, তাহারও কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না। কোন এক কার্য্য না করা এবং সেই কার্য্য করিতে না পারা এই দুয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ। ঈশ্বরপরায়ণ সাধু যে অসৎ কার্য্য কোন মতেই করিতে না পারেন এবং যাহার অসৎ চিন্তা হইতেও তিনি নিবৃত্ত থাকেন, ঈশ্বরশূন্য মনুষ্য ইচ্ছা করিলে সেই কার্য্য স্বচ্ছন্দেই করিতে পারে। ঈশ্বরই একমাত্র ধর্ম্ম-পথের নেতা এবং ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আত্মার স্বাধীনতা এবং ঈশ্বরের নিকট আপন কার্য্যের জন্য দায়িত্বই আমাদিগকে ধর্ম্ম পথে স্থির রাখার মূল কারণ; ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন এবং ঈশ্বর-উদ্দেশে সমুদায় কার্য্য করাই ধর্ম্ম; যদি ঈশ্বরেই বিশ্বাস না করিলাম, যদি সেই দায়িত্বই এক কালে উন্মূলিত হইল, তাহা হইলে আর ধর্ম্ম কোথায়; ধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র হইয়া পড়ে, তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব কিছুই থাকে না। যেখানে ধর্ম্মই নাই, সেখানে ধর্ম্মাচরণ কি রূপে

সম্ভবে, ধর্ম্মপথই নাই, তবে ধর্ম্মপথে চলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে। এই রূপে দেখা যায় যে, যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে আমরা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারি না ; ঈশ্বরকে অন্তরিত করিয়া আত্মার ধর্ম্মপথে স্থির থাকা দূরে থাকুক,সে ধর্ম্মপথকে প্রাপ্ত হইতেও পারে না। ঈশ্বরশূন্য, জীবনরহিত আত্মা যে কার্য্য করে, তাহা কোন এক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন ভিন্ন ধর্ম্মাচরণ নহে, এবং সেই কার্য্যেতে সে আত্মা যে সর্ব্ব কালে দৃঢ় থাকিবে. তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই ; বরং স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া ক্রমে অধো-গতি প্রাপ্ত হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সেই অবস্থা কি শোচনীয় ? যেখানে আমাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব থাকা আবশ্যক সেই খানেই যদি দাসত্ব স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে আর আমাদের দুঃখের শেষ কোথায় ? যে ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের উপর আত্মা রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপন কর্ম্মফলে তাহাদেরই অধীনত্ব স্বীকার করিতেছে; এমন বল নাই, এমন স্বাধীনতা নাই যে, প্রবৃত্তির প্রতি-কূলে কিছুমাত্র কার্য্য করিতে পারে, আপন ইচ্ছানুসারে এক পদ মাত্রও অগ্রসর হইতে পারে, তখন আর কষ্টের কি সীমা থাকে, বিশেষতঃ যখন ইন্দ্রিয় সমুদায় নিতান্ত প্রবল হইয়া আমাদিগকে কুপথে লওয়ায়, অথচ আমরা যে তাহাদের দাস হইয়া, তাহারা যে দিকে লওয়াইতেছে সেই দিকেই গমন করিতেছি, স্বীয় স্বাধীন-তানুসারে কিছুমাত্র কার্য্য করিতেছি না, ইহা আমাদিগকে জানি-তেও দেয় না, যখন পুষ্পহারভ্রমে দাসত্বশৃঙ্খলকে ধারণ করি, শ্রেয় বোধে প্রেয়ের পথকে অবলম্বন করি, কোথায় গমন করিতেছি তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না, কি দুরবস্থা হইতেছে তাহা কিছুই অনুভব করিতে শক্ত হই না, তখন আর শোকের পরিসীমা থাকে না, তখন এক কালে দুঃখের পরা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হই, যার পর নাই জঘন্য অবস্থায় পতিত হইয়া ক্রমিকই শোক করিতে থাকি।

আত্মাকে এই প্রকার মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় আছে কি না ? কোন্ ঔষধ দ্বারা আমরা এই মহৎ রোগ

হইতে মুক্ত হইতে পারি ? উপরেই দেখিয়াছি যে "যাঁহারা ইঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন ;" ঈশ্বরকে জানিয়া আমরা অমর হই। ইহাতে আপাততঃ এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, আত্মা স্বভাবতঃই অবিনশ্বর, তবে ঈশ্বরজ্ঞান দ্বারা অধিক কি ফল লব্ধ হইল ? কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব যে এ প্রশ্ন সঙ্গত নহে, ঈশ্বরকে জানিয়া আমরা যে অমৃতত্ব লাভ করি তাহা কেবল আত্মার অবিনশ্বরত্ব নহে, আত্মা অবিনাশী ও কল্পান্ত স্থায়ী হইলেও তাহা রোগ শোকে পরিপূরিত হইতে পারে; তখন তাহাকে প্রকৃত রূপে অমর বলা যায় না, কিন্তু যখন আত্মা ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করত ঈশ্বরভাবে পরিপূরিত হইয়া বিগতশোক হয়, তখনই আত্মা প্রকৃত অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরকে জানিয়া মহাবিনাশ হইতে রক্ষা পাই এবং আত্মার সমুদায় রোগ হইতে মুক্ত হইয়া অমর হই।

এক্ষণে দেখা যাউক আমরা এই অমৃতের পথে কি রূপে গমন করিতে সক্ষম হই, কি প্রকারে পরমাত্মাকে জানিতে পারি। পরমাত্মাকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইলেই প্রথমতঃ তাঁহাতে বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে হইবে। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতিরেকে আমরা কখনই ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হই না। অনেক সময় আমরা কিছুমাত্র পরীক্ষা না করিয়া মনে করি যে, আমাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে; কিন্তু অতি অল্প পরীক্ষা করিলেই অনেক সময় এ প্রকার সিদ্ধান্ত ভ্রমমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা এই ঋষিবাক্যের যথার্থতার বিলক্ষণ পরিচয় পাই যে "যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে আমি ব্রহ্ম স্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই ;" তখন সহজেই বুঝিতে পারি যে, অনেক সময় আমরা মনে করি ব্রহ্মকে জানিয়াছি এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস সংস্থাপন করিয়াছি, সেটি আমাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। অতএব প্রথমত দেখিতে হইবে যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস আছে কি না, যদি ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস না থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে জানি-

য়াছি কি প্রকারে বলিতে পারি ; অনেক সময় বিশ্বাস না থাকিলেও আমরা ভ্রমক্রমে, মনে করি যে আমাদের বিশ্বাস আছে ; অতএব সে বিষয়ও পরীক্ষা-সাপেক্ষ। সামান্যতঃ কোন কারণের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে হইলে প্রথমতঃই কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয় ; যদি আমরা জানি যে এই প্রকার কারণ হইতে এইরূপ কার্য্য উদ্ভব হয় তাহা হইলে সেই কারণ উপস্থিত আছে কি না ইহা নির্ণয় করিতে গেলেই দেখিতে হইবে যে তাহার অনুরূপ কার্য্য বর্ত্তমান আছে কি না ; যদি সেই কার্য্য গুলি বর্ত্তমান না থাকে তাহা হইলেই নিশ্চয় জানিব সেখানে সেই কারণেরও অসদ্ভাব। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রধান ফল ঈশ্বরে পূর্ণ প্রীতি ; পরমাত্মাতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মার সমাধান ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ ও তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর, পূর্ণ প্রীতির বিবিধ অঙ্গমাত্র। যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি সেই পরম মঙ্গলময়ের সমুদায় স্বরূপ বিশ্বাসনেত্রে দৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কখনই তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। ইচ্ছা পূর্ব্বক কাহাকেও প্রীতি করিতে হয় না, যে কোন বস্তুতে প্রীতির উপযোগী গুণ সমস্ত থাকে মানবাত্মা আপন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাহাকে প্রীতি করে, প্রীতি না করিয়া কখন ক্ষান্ত থাকিতে পারে না, কিন্তু যাঁহাকে প্রীতি করিতে হইবে তাঁহার যে সেই সমস্ত গুণ আছে তাহা না জানিলে কি প্রকারে প্রীতি করিতে পারি এজন্য তাঁহাকে প্রীতি করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে সেই সমস্ত গুণ আছে তাহা জানা আবশ্যক। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই আমরা পরমাত্মার সেই সমস্ত মঙ্গলময় স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হই ; এবং তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। অতএব ঈশ্বরে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত কেবল এই মাত্র জানা আবশ্যক যে ঈশ্বরকে আমি সম্পূর্ণ রূপে প্রীতি করি কি না ? যদি ঈশ্বরকে আমি সম্পূর্ণ রূপে প্রীতি না করি তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নাই কেন না

ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে তাঁহার মঙ্গলময় স্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হইতাম, এবং পরাৎপর জগৎপাতার অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ ও অনির্ব্বচনীয় মহিমার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারিতাম না। কিন্তু আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি কি না তাহা কি রূপে অবগত হইব? ইহাতেও আমার ভ্রম হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, প্রকৃত রূপে প্রীতি না করিয়াও হয় তো ঈশ্বরকে প্রীতি করিতেছি বলিয়া মনকে মিথ্যা স্তোভ দিতে পারি; অতএব এ বিষয়েও পরীক্ষা আবশ্যক। প্রীতির কার্য্য কি? প্রিয়তমের প্রিয় কার্য্য সাধনই প্রীতির এক প্রধান কার্য্য। আমি যদি বলি যে ঈশ্বরকে আমি প্রীতি করি অথচ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করি না তাহা হইলে নিশ্চয় জানিব যে আমি ঈশ্বরকে প্রীতি করি না, কেন না যখন আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করি তখন তাঁহার কোন এক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে আত্মা কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, প্রীতির প্রধান লক্ষণ এই যে কিসে প্রিয়তমের ইচ্ছানুরূপ সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন হইবে তজ্জন্য আত্মা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে সে বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই মন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হয়। সেই রূপ যখন আমরা ঈশ্বরকে প্রীতি করি তখন কোন মতেই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না। কিসে তাঁহার সমুদায় আজ্ঞা সুচারু রূপে পালন করিব তজ্জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়, পাছে কোন প্রকারে কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় আত্মা সেই জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকে; কাজে কাজেই পাপ আসিয়া অন্তরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। ঈশ্বরভাবে আত্মা সর্ব্বদা পরিপূরিত থাকায় সংসারের কোন প্রকার প্রলোভনও সেই আত্মাকে কোন মতে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

প্রীতির আর এক প্রধান লক্ষণ এই যে যখন আমরা কাহাকেও প্রীতি করি তখন তাহার নিকট সর্ব্বদা থাকিবার জন্য মন নিতান্ত

উৎসুক হয়। ঈশ্বরপ্রীতি ও সেই রূপ। যখন ঈশ্বরে আমরা পূর্ণ প্রীতি সংস্থাপন করি তখন সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিবার জন্য মন নিতান্ত উৎসুক হয়, তাঁহার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ লাভের জন্য আত্মা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়, কাজেই আত্মাতে ঈশ্বরকে ধারণ করিবার জন্য চেষ্টা যার পর নাই বলবতী হইয়া উঠে, এবং ঈশ্বরের উপাসনারূপ সুমধুর ফল তাহা হইতে নিঃসৃত হয়; সেই ফলের স্বাদ যিনি একবার গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন তিনি আর তাহা কখনই ভুলিতে পারিবেন না। তর্ক দ্বারা যিনি যত দূর ইচ্ছা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করুন না কেন যিনি কখন প্রকৃত রূপে উপাসনা করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন যে উপাসনা আমাদের কত দূর প্রয়োজনীয়, যিনি সেই অমৃতময় ফলের স্বাদ এক বার গ্রহণ করিয়াছেন তিনিই বলিতে পারেন যে, উপাসনার জন্য আত্মা বারম্বার আগ্রহান্বিত হয় কি না? এদিকে উপাসনার লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই যে ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা। অতএব প্রীতি, উপাসনা ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন ইহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের যে প্রকার সম্বন্ধ এবং তাহারা পরস্পর যে রূপ গূঢ় ভাবে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহাতে তাহাদের প্রতি যে রূপে যে ভাবেই দৃষ্টি করি না কেন একের অস্তিত্বেই অপর দুইটীর অস্তিত্ব উপলব্ধ হইবে এবং কোন একটীর অভাব থাকিলেই জানিব যে তিনের অসদ্ভাব। অতএব ঈশ্বরকে আমরা প্রীতি করি কি না এই বিষয়ের যখন পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই তখন যেন ইহাই দেখি যে আমরা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছি কি না, যদি পরীক্ষা কালে দেখি যে আমরা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছি না আমাদের পরমারাধ্য পিতার আদেশের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিতেছি অথবা কোন বিষয়ে, তাহা যত সামান্যই হউক না কেন, অতি ক্ষুদ্রতম পরিমানেও তাঁহার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতেছি তাহা হইলেই নিশ্চয় জানিব যে আমরা

তাঁহাকে প্রীতি করিতেছি না; কাজেই তাঁহাতে আমাদের বিশ্বাস নাই এবং আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি নাই। যদি আত্মা তাঁহাকে জানিতে না পারিল যদি আত্মা ঈশ্বরভাবে সর্ব্বদা পরিপূরিত না রহিল, যদি এখানে থাকিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে না জানিলাম তবে আর আমরা কি প্রকারে অমর হইব, কোন্ উপায় দ্বারা আত্মাকে মহাবিনাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিব? পূর্ব্ব কালের ঋষিরা বলিয়াছেন যে এখানে থাকিয়াই আমরা ঈশ্বরকে জানিয়াছি তখন আমরাও যে এই খানে থাকিয়াই তাঁহাকে জানিতে পারি সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি তাঁহাকে জানিবার কিছুমাত্র উপায় না থাকিত যদি এমন হইত যে এখানে থাকিয়া পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না তাহা হইলে ঈশ্বরকে না জানিলে আমরা দোষভাগী হইতাম না। কিন্তু যখন কেবল আমাদের আয়াস দ্বারা তাঁহাকে জানা যাইতে পারে তখন যদি আমাদের নিজের শৈথিল্যে আমরা তাঁহাকে না জানি তাহা হইলে আমরা যে কি ভয়ঙ্কর মহাপাপে লিপ্ত হই, আপনাদের অবস্থাকে আপনাদের দোষে কত দূর শোচনীয় করিয়া ফেলি তাহা অনুভব করিয়া উঠা সুকঠিন।

ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ? আসুন আমরা একবার আপন আপন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই; একবার দেখি যে আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি রূপ? আমরা প্রকৃত রূপে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছি কি না? একবার অন্তর্দৃষ্টি সহকারে আত্মার প্রতি দৃষ্টি করুন, এবং সরল ভাবে বলুন যে আমাদের দ্বারা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সমুদায় প্রকৃত রূপে সংসাধিত হইতেছে কি না? সরল ভাবে আত্মার প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে আমরা আমাদের পরম পিতার কোন আদেশই প্রতিপালন করিতেছি না; বরং আমরা অনেক সময়েই ঈশ্বরের নিয়ম সমূহের বিরুদ্ধাচার করিতেছি। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছি না। আমরা সংসারের দাস, মনুষ্যের ভয়ে আমরা ঈশ্বরকে ভুলিতেছি, পাপের

প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পবিত্র নিয়ম সমুদায় উল্লঙ্ঘন করিতেছি। তবে আমাদের প্রীতি কোথায়? ভ্রাতৃগণ? ঈশ্বরকে প্রীতি না করিয়া আমরা কি ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারি? না বিশ্বাসের অভাবে আমাদের পরিত্রাণের কিছুমাত্র প্রত্যাশা থাকে? তবে কি নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছি, কোন্ সাহসেই বা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট শ্রেয়ের পথকে ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি।

ভ্রাতৃগণ! আর নিশ্চেষ্টতার সময় নাই। মোহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হউন, পতি মুহূর্ত্তেই আমাদের ইহ জীবনের কথঞ্চিৎ ভাগ বিনষ্ট হইতেছে, যে সময় একবার অতিবাহিত হইতেছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, যে কিছু সুযোগ আমাদের হস্তে আছে, সময়ে তাহার সদ্ব্যবহার না করিলে পরে আর কোন ফল দর্শিবে না। এ নিরুদ্যোগের বা দীর্ঘসূত্রিতার সময় নহে; মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই কখন আসিয়া গ্রাস করিবে তাহার কিছুই বলা যায় না; এই নিমিত্ত পূর্ব্বাহ্নেই আমাদের প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। আসুন এই মুহূর্ত্ত হইতেই আমরা আমাদের পরম পিতার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে এবং সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করতঃ তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হই। জানিয়া শুনিয়া আর কত দিন আমরা জঘন্য মহাপাপে লিপ্ত থাকিব, কত দিন ঈশ্বরের সমুদায় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করত তাঁহার আজ্ঞাকে উপেক্ষা করিব। কত দিন অতীব ঘৃণিত কপটাচারের দাস হইয়া আমরা ঈশ্বরের নামে লজ্জিত হইব এবং এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কলঙ্কারোপ করিব। কাহার ভয়ে আমরা ভীত হইতেছি কাহার অনুরোধে আমাদের পরম পিতা পরাৎপর পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিতেছি? কি নিমিত্তই বা কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পশুবৎ কার্য্য করিতেছি বিবেচনা করিতেছি বলিয়া আর কত কাল বৃথা অতিবাহিত করিব? ভ্রাতৃগণ! আর চিন্তার সময় নাই এখন কার্য্যের সময় অতএব এই

মুহূর্ত্ত হইতেই পাপাচার এবং কপট ব্যবহার সমুদায় পরিত্যাগ করুন। এবং যেখানে আমরা ঈশ্বরের উপাসনার জন্য একত্রিত হইয়াছি সেই খান হইতেই—এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজ হইতেই আমাদের পরম পিতার অপ্রিয় সমুদায় কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য কৃতসংকল্প হউন, এবং এখান হইতে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বে আসুন আমরা সকলে এই জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যেন মন, বুদ্ধি, কার্য্য, বা বাক্য দ্বারা কোন রূপে এমন কোন কার্য্য না করি যাহাতে আমাদের কর্ম্ম দোষে আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের নামে অথবা এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের নামে কলঙ্কারোপ হইতে পারে। ভ্রাতৃগণ ? আর সময় নাই, এই মুহূর্ত্ত হইতেই সচেষ্ট এবং উদ্যুক্ত হউন এবং ঈশ্বরকে একমাত্র সহায়, ধর্ম্মকে একমাত্র সম্বল এবং পরম পিতার করুণাকে একমাত্র আশ্রয় করত সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণ ও কপট ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া পবিত্র পুণ্য পদবীতে পদার্পণ করত ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর ন্যায় অনন্ত পথের পথিক হউন।

"পরমাত্মন্ ! পাপ তাপে তাপিত এবং দুশ্চিন্তায় চিত্ত মলিন হইয়া তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় না। কত বার মনে করি যে পাপের প্রলোভনকে সম্বরণ করিয়া তোমার পথের পথিক হই। কত বার দুর্ম্মতি ও পাপচিন্তা হইতে বিরত থাকিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পুনরায় পাপপঙ্কে পতিত হই ; এবং ক্রমে কলুষিত আত্মাকে আরও দুরবগাহ পাপসলিলে নিমগ্ন করি।" "করুণাময় ! আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না, তোমার সন্তান—তোমার দাস হইয়া তোমার উপাসক বলিয়া পরিচয় দিতে পারি না ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। দীননাথ ! সাহায্য বিতরণ কর, ভগ্ন হৃদয়কে সবল করিবার জন্য তুমিই একমাত্র বল ; হে সর্ব্বাশ্রয় ! আশ্রয় প্রদান কর, যাহাতে আমরা কোন মতে ভগ্নোৎসাহ না হই। পিতঃ ! আমরা সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও তোমার অধম সন্তান, এ কারণ এই বলবতী আশা আমাদের মনে প্রদীপ্ত আছে যে করুণাময়ের করুণার অভাব নাই, তুমি কখনই

হীনবল সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিবে না। পরমাত্মন্! আমাদের হৃদয়ে এই আশাকে সর্ব্বদা জাগরূক রাখ, এবং প্রীতি, পবিত্রতা এবং স্বাধীনতাতে আমাদের আত্মাকে প্রজ্বলিত কর যাহাতে তোমার নামে আমাদিগকে ভীত হইতে না হয়; এবং আমাদিগকে সেই স্বর্গীয় বল প্রদান কর, যাহাতে কেবল তোমাকে প্রীতি এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সাধনে সমুদায় প্রাণ, মন, এবং হৃদয়কে নিয়োগ করিতে পারি। হে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা! এই প্রার্থনা সিদ্ধ কর, যেন এই পবিত্র সমাজ হইতে আমরা শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া না যাই।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

———o———

পঞ্চম উপদেশ।

৫ মাঘ সোমবার ১৭৯১ শক।

"নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।"

"যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।"

ঈশ্বর স্রষ্টা ও উপাদান স্বর্গীয় এই উভয়ের গুণেই ধূলিনির্ম্মিত মনুষ্যের প্রকৃতি এত সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু দেখ প্রত্যেকেরই অন্তরে দেবাসুরের সংগ্রাম হইতেছে। কখন দেবতাদিগের জয় অসুরগণের পরাজয় কখন বা ইহার বিপরীত। যদি একটি দেবতা জয় লাভ করিতে পারিলেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, আবার যদি একটি অসুরের জয় হয় তাহা হইলে অন্যান্য অসুরের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না, এই ব্যাপার দেখিলে বোধ হয় যেন এই উভয় মনুষ্য পক্ষেরই দাস। অন্তরে যে প্রবৃত্তি যখন প্রবল হইতেছে মনুষ্য তাহারই পরিচর্য্যা

করে। হয় তো সে কখন প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সংসারকে বলি প্রদান করিয়া নির্জ্জনে অরণ্যে বসিয়া আছে, না হয় বিষয় কোলাহ-লের মধ্যে ঘোর বিষয়ী হইয়া বিষয় মদে হতচেতন হইতেছে। প্রবৃত্তি তাহাকে কহিল তুমি আমার নিমিত্ত জীবন দেও সে অমনি প্রস্তুত। আবার তাহারই আদেশে স্বহস্তে শত শত মনুষ্যের শোণিতে ধরাকে কলঙ্কিত করিল। প্রবৃত্তি কি রূপে তৃপ্ত থাকে এই তাহার লক্ষ্য। যদি পর্ব্বতের সমানও বিঘ্ন তাহাকে প্রতিরোধ করে, কিছুতেই সে অধ্য-বসায় পরিত্যাগ করিবে না। প্রবৃত্তিই তাহার উপাস্য দেবতা।

ঈশ্বর যে প্রকৃতির আদর্শ সে কি এই রূপ কুৎসিত, কখনই না। যিনি বিষম-প্রকারের প্রবৃত্তি দিয়াছেন তিনিই আবার ইহাদিগকে নিয়মিত করিবার নিমিত্ত বিবেককে প্রেরণ করিয়াছেন। বিবেক উৎকৃষ্ট সারথির ন্যায় উহাদিগকে সুপথেই লইয়া যায়, কুপথে ধাবিত হইলে নিশ্চয়ই কষাঘাত করে। তুমি বিবেককে কলুষিত করিও না তোমার ইচ্ছা মঙ্গল কার্য্যও মঙ্গল হইবে। জ্ঞান ও ভাব প্রশস্ততা লাভ করিবে। স্বার্থ ও নীচ ভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং ঈশ্বর সন্নিহিত থাকিবেন।

প্রত্যেককে যেমন বিবেকের আশ্রয় লইতে হইবে সেই রূপ বৈরাগ্যকেও অবলম্বন করিতে হইবে। এই বৈরাগ্য স্ত্রী পুত্রের প্রতি নয়, ধন সম্পদের প্রতি নয়, সংসারের প্রতি নয়, ইহা পাপের প্রতি অধর্ম্মের প্রতি। প্রতিদিন দেখিতে হইবে আমি কতটুকু অবৈধ ব্যবহারে বিরাগ প্রদর্শন করিতে পারিলাম। কারণ যদি অনুমাত্র পাপকে প্রশ্রয় দেও সে অল্পে অল্পে তোমার বিবেককে গ্রাস করিবে। অতএব সকলে বৈরাগী হও, চল সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের দ্বারে গমন করি, বলি, পিতঃ! আমরা বিষয় সুখ পরিত্যাগ করিয়া তোমার দ্বারে আইলাম. এখন কি ভিক্ষা দিবে, দেও।

এই রূপ সন্ন্যাসাশ্রম যিনি প্রকৃত রূপে অবলম্বন করিতে পা-রিলেন, তাঁহার অরণ্যে প্রয়োজন কি, যে সমস্ত ইন্দ্রিয় মনুষ্যত্ব ভ্রংশের কারণ হয়, তাহার দ্বার রোধ করিবার আবশ্যক কি?

কাষায় বসন প্রভৃতি বাহ্য চিহ্ন ধারণ করিবার অধিকার কি? তিনি ত এই জনকোলাহল পূর্ণ সংসারে থাকিয়াই বিষয় বিদ্বেষী সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার সমাধি পৃথিবীতে নয় ঈশ্বরেতেই হইবে।

মনুষ্য আপনার প্রকৃতিতে ঈশ্বর জ্ঞান অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, জ্ঞান লাভের যে কএকটি দ্বার আছে, তাহার সাহায্যে সেই জ্ঞানকে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে. কিন্তু যত দিন না বিবেককে নির্ম্মল করিবে যত দিন না বৈরাগ্যের আশ্রয় লইবে তত দিন কোন প্রকারে তাহার ঈশ্বর লাভ হইবে না। গ্রন্থ পত্রে ঈশ্বর নাই, গ্রন্থের কীট হইয়া থাকিলেও ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর আত্মাতে, আত্মা পবিত্র না হইলে তাঁহার সন্নিকর্ষ উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু প্রমাদী মনুষ্য তাহা বুঝে না। সে আপনার দোষেই আপনাকে নষ্ট করে। কোথায় এই সংসার সুখের রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য হইয়া বিরাজ করিবে তাহা না হইয়া মনুষ্যের দোষে ইহা দিন দিন কি রূপ কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছে। এখনও এই সংসারের কোন স্থলে দেখিতে পাইবে পিতা পুত্রকে ও পুত্র পিতাকে সময় বিশেষে বিশ্বাস করেন না। ভ্রাতা ও ভগিণীতে সদ্ভাব নাই। স্বামী ও স্ত্রী প্রীতির পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারেন না। বন্ধু বন্ধুর অন্তরে অস্ত্রাঘাত করিয়া থাকেন। তুমি যাহার অন্ধকারে আলোক দিবে সে তোমার অন্ধকারের আলোক নির্ব্বাণ করিবে। তুমি যাহার পথের কন্টক শোধন করিবে সে তোমার পথে কন্টক রোপণ করিবে। আবার কিঞ্চিৎ অনুসন্ধিৎসু হইয়া পরস্পর অসম্বদ্ধ মনুষ্যের বিষয় আলোচনা কর দেখিতে পাইবে যাহারা বাণিজ্যের বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই আপনার কপটতাকে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিয়া তাহারই বাণিজ্য করিতেছেন। লোককে বঞ্চনা করাই ইহাদিগের শিক্ষিত বিদ্যা। ধর্ম্মালয়ে প্রবেশ কর দেখিতে পাইবে অনেকেই ধর্ম্মকে আপনার দুরভিসন্ধি সাধনের যন্ত্র করিয়া বসিয়া আছেন, ধর্ম্মের নামে পবিত্র ঈশ্বরের নামে আপনার গৌরব প্রচার করাই তাঁহাদিগের কার্য্য। গ্রন্থালয়ে

পদার্পণ কর অনেককেই দেখিবে কোথায় ফলভরে বৃক্ষ অবনত হইবে তাহা না হইয়া তিনি উন্নত শিখরে স্ফীত হইয়া আছেন। তিনি প্রকৃতির রসপান করিয়া কোথায় প্রকৃতির অতীতকে দেখিবেন তাহা না হইয়া তিনি আপনাকেই দেখিতেছেন। ধনীর আগারে অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে কোটি কোটি সুবর্ণ তাঁহার শুশ্রূষার্থ ব্যয়িত হইতেছে, হয় তো সাধুতার ভান করিয়া আপনার যশোলিপ্সায় অকাতরে কার্য্য বিশেষে বিস্তর দান করিতেছেন কিন্তু তাঁহারই দ্বারের অতিথি ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়াছে এইরূপ এক হতভাগ্য মুষ্টি ভিক্ষাও পাইল না। এখনও এই পৃথিবীতে একজন আপনার বিবেক ও বিশ্বাসের অনুরোধে অগ্রসর হইয়াছেন আর শত শত ব্যক্তি তাহার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে লোষ্ট নিক্ষেপ করিতেছেন। এখনও প্রকৃত মঙ্গলের বার্ত্তা দূরে রহিয়াছে কিন্তু সামান্য মত-ভেদ লইয়া পরস্পরের বিদ্বেষ বুদ্ধি উপস্থিত হইতেছে। এখনও কিঞ্চিৎ উন্নত ঈষৎ অবনতকে সাহঙ্কার বাক্যে পরিহাস করিয়া তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছেন কিন্তু অনন্ত উন্নতি যে তাঁহার সম্মুখে ভ্রমেও একবার তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। এখনও বিভিন্ন সম্প্রদায়-গত বৈরানল প্রবল বেগে জ্বলিতেছে এবং ধর্ম্ম ও ঈশ্বর উপেক্ষিত হইতেছেন। এখনও স্বার্থের অনুরোধে অনেক স্থলে অধর্ম্মের জয় ধর্ম্মের পরাজয় হইতেছে, বিজ্ঞ বৃদ্ধের অবমাননা হইতেছে এবং অমঙ্গলের স্রোত আনয়ন করা হইতেছে। এইরূপে ধন মদ, বিদ্যা মদ ও ধর্ম্মমদে সমুদায় ছার খার হইতেছে। মনুষ্য! এইরূপ অবস্থায় তুমি কোন্ সাহসে ঈশ্বরকে পাইবার প্রত্যাশা করিবে।

মানিলাম প্রতি বৃক্ষের পত্রে তুমি ঈশ্বরেরই রচনা দেখিতেছ, পক্ষীর দেহ সৌন্দর্য্যে ঈশ্বরেরই হস্ত দেখিতেছ, এই সুনির্ম্মল চন্দ্রালোক তোমার নিকট ঈশ্বরেরই আলোক বহন করিতেছে, সমীরণ তোমার কর্ণে তাঁহারই বার্ত্তা প্রচার করিতেছে, এই বাহ্য প্রকৃতি ও অন্তর্জগৎ তোমার ঈশ্বর জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে কিন্তু তুমি

নিশ্চয় জানিও ইহাতেও তোমার ঈশ্বর লাভ হইতেছে না। যত না তুমি তোমার ইন্দ্রিয়গণকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মের আয়ত্ত করিতেছ এবং আপনার আত্মাকে তাঁহার পবিত্র মন্দির করিতেছ, তত দিন তোমার নিকটে ঈশ্বর থাকিবেন বটে কিন্তু তুমি তাঁহাকে পাইবে না। যদি তাঁহাকে দেখিতে চাও তবে অন্তর হইতে অসঙ্গত ইচ্ছা সকল দূর করিয়া দেও, যে সকল আচারে তুমি আপনিই কুণ্ঠিত হইবে তাহা পরিত্যাগ কর। শান্ত দান্ত ও বিনীত হও ঈশ্বর অবশ্যই তোমার ইচ্ছা সফল করিবেন।

জগদীশ্বর! কি রূপে তোমাকে পাইব কিছুই জানি না। আমাদিগের হৃদয় শুষ্ক ভক্তি ও প্রীতি নিতান্ত দুর্ব্বল। আমরা এই সংসারে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় পড়িয়া আছি। অমৃত লাভের প্রত্যাশায় কলশের ভিতর হস্ত প্রসারণ করি কিন্তু তাহাতে যে কাল সর্প আছে অগ্রে তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা সংসারে সুখের প্রত্যাশায় যে কার্য্যে যাই পরিণামে তাহাতেই বিপদ ঘটে। তুমি আমাদিগের সহায় হও। যদি আমাদিগের কোন রূপ চাঞ্চল্য দেখ ক্ষমা করিও। তোমার নিকটে এই আমাদিগের নিবেদন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ষষ্ঠ উপদেশ।

৬ মাঘ মঙ্গলবার ১৭৯১ শক।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

উত্থান কর—জাগ্রত হও।

যিনি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেমের সাগর সেই অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কি কখন অসাড় হইয়ামোহ নিদ্রায় —অজ্ঞান নিদ্রায় অভিভুত থাকিতে পারেন? তিনি সর্ব্বদা জাগ্রত সতর্ক ও সাবধান থাকেন। পাপালাপ—পাপ চিন্তা—পাপানুষ্ঠান এ তিন হইতেই তিনি প্রাণপণে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। পাছে কোন সূত্রে পাপ শত্রু হৃদয়কে অধিকার করে, তাহার জন্য তিনি

অতি সুচতুর প্রহরীর ন্যায় কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি অনবরত আত্ম-চিন্তা করেন,—সকল অবস্থায় সকল সময়ে—এমন কি ঘোর বিষয়-কর্ম্মের কোলাহল মধ্যেও তিনি আত্মানুসন্ধান করেন। পাছে তাঁহার মুখ হইতে অশ্লীল বাক্য নির্গত হয়,—পাছে নিষ্ঠুর কথা বহির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী লোকের কোমল হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করে—পাছে স্পষ্ট বা প্রকারান্তরে বা ভঙ্গি ক্রমে পরনিন্দা প্রকাশ পায়—পাছে বিগর্হিত আত্ম প্রসংশা মুখ হইতে বাহির হয়—পাছে পাপ চিন্তা হৃদয়কে অন্ধকারাবৃত করে ও পাপানুষ্ঠান রূপ মহা ব্যাধি আত্মাকে আক্রমণ করে—ইহার জন্য তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া সতর্কতা-রূপ অসি হস্তে করিয়া জাগ্রত থাকেন। কারণ তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে বিন্দুমাত্র ছিদ্র দ্বারা অতি বৃহৎ অর্ণবযানও জল মগ্ন হইয়া থাকে। পাপকে বিন্দু মাত্র প্রশ্রয় দিলে কালে তাহার সহিত সংগ্রাম করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম্ম। যে গৃহে অশ্বত্থ বৃক্ষের সিকড় একবার বদ্ধ মূল হয় তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে উৎ পাটন করা কি ঘোর আয়াস সাধ্য ব্যাপার। তিনি পাপকে এত ভয় করেন—যে পাপের নাম শ্রবণ মাত্রেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, শরীর অসাড় হয় ও বাক্য স্তব্ধ হয়। বিনীত সাধক মাত্রেরই এই রূপ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। ভবিষ্যতে পাছে অমঙ্গল ঘটে তাহার জন্য তিনি যেমন সাবধান—ভুত কালে কি কি কার্য্য করিয়াছেন—তাহাতে কি কি দোষ ঘটিয়াছে—ভবিষ্যতে আর তেমন না হয়—সে জন্যও তিনি প্রস্তুত। নিরভিমান হইয়া তিনি তন্ন তন্ন করিয়া নিজ আত্মার পরীক্ষা করেন। কদাপি তাহাতে পক্ষপাত করেন না। তিনি নিজাত্ম দর্শন লালসায়ও আত্ম-পরীক্ষা করেন না, যে তিনি পক্ষপাত করিবেন, স্বীয় ত্রুটি নিজ দোষ ও পাপ হৃদয়ে কি প্রকারে অবস্থিতি করিতেছে—তাহাই জানিবার জন্য তাঁহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান। যেমন সুনিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসক ক্ষত-স্থান পরীক্ষার জন্য প্রথমে উহাকে শলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেখেন—কত দূর রক্ত মাংস দূষিত হইয়াছে, তিনিও তেমনি আপনার অন্তর

রোগের আপনি চিকিৎসক হইয়া—গভীর রূপে নিজ অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি অতি সামান্য ত্রুটি ও পাপের অবধি পরিচয় লইয়া থাকেন। সত্য বটে ইহাতে আপাততঃ ক্লেশ বোধ হয়—যেমন অতীত বিষয় কীর্ত্তনের সময় তাহাকে প্রত্যক্ষানুভূতের ন্যায় বোধ হয়, তেমনি স্বীয় কৃত পাপ সকলের আলোচনার সময় অবশ্যই তাহাদের বিকট মূর্ত্তী মনো মধ্যে দেখিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইতে হয়—কিন্তু সেই অনলেই আত্মা বিশুদ্ধ হয়। কে না দেখিয়াছেন যে মলিন স্বর্ণ দগ্ধ হইয়া কেমন উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে। হা! সে কি মনোহর শোভা! আত্মা যখন পাপ হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার শোভাও তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে। কি সুখী সেই মনুষ্য—সেই নিরভিমান মনুষ্য! যিনি অনবরত দিন যামিনী আপনাকে এই রূপ সংশোধন করিতেছেন। তিনি নিমিষে নিমিষে নূতন বল প্রাপ্ত হন। নূতন নূতন প্রসাদ ও আনন্দ উপভোগ করেন। তাঁহার শুভ্র আত্মাতে সেই চন্দ্রমার—চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কেমন প্রতি ফলিত হয়। পুণ্য কি নিমিত্ত যে প্রাণদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে—তাহার অর্থ তখন তিনি স্বীয় জীবন পুস্তকে পাঠ করিতে থাকেন। তিনি তখন স্পস্ট দেখিতে পান যে অন্তরতম পরমেশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যে পাপ ভিন্ন আর কোন ব্যবধান হইতে পারে না। পাপই মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করে। মনুষ্য যত পবিত্র হয় সে তত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হয়। দিন দিন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যে কি সুখ—জানি না আমি কি বাক্যে তাহা ব্যক্ত করিব। দূরস্থিত কুসুম কাননের মনোহর সুগন্ধ—বা হৃদয় প্রফুল্লকর সংগীত লক্ষ্য করিয়া পথিক যতই তাহাদের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সেই প্রকার যিনি প্রতি দিন স্বীয় পাপ রাশিকে নিজ যত্ন ও ঈশ্বরের প্রসাদ রূপ বারি দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া অনন্ত প্রীতির অভিমুখে গমন বরেন। তাঁহার আনন্দ দিন দিন বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হয়। হায়! সে আনন্দের তুলনা কোথায়!

কি অসুখী সেই আত্মা যিনি মোহ নিদ্রায় অবিভূত হইয়া—অভি-মানের দাস হইয়া আপনার ক্রটি দোষ ও পাপের পরিচয় লন না—যিনি আপনাকে সংশোধন করিতে চান না। তিনি আমোদ প্রমোদের আবরণে পাপের অগ্নিকে আবৃত করিতে যান। বিলাসের ঘৃত দ্বারা স্বকৃত পাপ হুতাশনকে নির্ব্বাণ করিতে উন্মুখ—হা! কি ভ্রান্তি! হা! তাহার অবস্থা কি শোচনীয়? যে সুশীতল জলে এ অনল নির্ব্বাণ হইবে, তাহাকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিল। হে করুণাময় পরমেশ্বর! তুমি অনুকূল হইয়া তাহার মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দেও—তোমার পবিত্র প্রীতিতে তাহার মনকে নিমগ্ন কর।

হে অনাথ-শরণ পতিত পাবন! তুমি আমাদের এক মাত্র পরিত্রাতা তোমার নিকট আমরা ব্যাকুল অন্তরে ক্রন্দন করিতেছি তুমি আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন কর। পাপকে সমূলে বিনষ্ট কর—আত্ম প্রসাদে মনকে প্রফুল্ল কর—হৃদয়কে তোমার দুর্ল্ভ প্রীতি রসে নিমগ্ন কর—তোমাকে যেন দিনে নিশীথে হৃদয়ে হৃদয়ে আঁকিতে আঁকিতে রাখিতে পারি—তুমি ভিন্ন আর আমাদিগের গতি নাই—হে অগতির গতি গতি-নাথ! তুমি আমাদিগকে ক্ষণ মাত্রও পরিত্যাগ কর নাই—আমরাও যেন নিমেষের জন্যও তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তম উপদেশ।

৭ মাঘ বুধবার ১৭৯১ শক।

"ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ং।
বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারমীশং তং জ্ঞাত্বাঽমৃতা ভবন্তি।"

"বিশ্বকার্য্যের কারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ; তিনি সর্ব্বভূতে, শরীর-মধ্যে গূঢ় রূপে স্থিতি করিতেছেন। সেই বিশ্ব-সংসারের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক অমর হয়েন।"

আমরা অধঃ ঊর্দ্ধে, দক্ষিণ বামে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই সেই সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের মহীয়সী কীর্ত্তি-কলাপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাই নয়ন-গোচর হয়। তাঁহারই মহিমা ভূলোক দ্যুলোকে দর্শন করিয়া কে না আশ্চর্য্যে স্তব্ধ হয়? ঊর্দ্ধে জ্বলন্ত-অনল-নিকেতন সূর্য্য সহস্র রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া দিক্ বিদিক্ আলোকিত করিতেছে, গ্রহতারা সকল অনল পিণ্ডের ন্যায় আকাশ পথে প্রজ্বলিত হইতেছে, জ্যোতিঃপুচ্ছ ধূমকেতু সকল দিক্ দাহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে শূন্যপথে ধাবিত হইতেছে, বিদ্যুৎ বজ্র, মহাবলে গভীর নিনাদে নিম্ন ঊর্দ্ধ সকল স্থান কম্পিত করিতেছে, তাঁহার সৃষ্ট এই সকল প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান পদার্থ-পুঞ্জ অবলোকন করিলে কোন্ হৃদয়ে না তাঁহার মহান্ রুদ্র-ভাব উপলব্ধ হয়? কোন্ রসনা না সেই বিশ্ব-কারণ পরব্রহ্মের অতুল মহিমা অনুপম গুণ-গরিমা পরিকীর্ত্তন করিতে ধাবিত হয়?

ভূমণ্ডলের প্রতি চক্ষু উন্মীলন করিয়া যখন দেখা যায় যে মেঘমালা সদৃশ পর্ব্বত-শ্রেণী সকল দেশ বিদেশ অতিক্রম করিয়া আপন আপন প্রকাণ্ড শরীর উন্নত করত গগনস্পর্শ করিতে উত্থিত হইতেছে, বহু যোজন-ব্যাপী শিকতা সাগর সদৃশ জল প্রাণী হীন মরু প্রান্তর সকল প্রসারিত হইয়া প্রলয় ভাব প্রদর্শন করিতেছে, সিন্ধু সাগর সমুদায় পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া গভীর গর্জ্জনে প্রবল তরঙ্গ প্রহারে ভূভাগ প্লাবিত করিবার জন্য মুহুর্মুহু আক্রমণ করিতেছে, নদ নদী সকল পর্ব্বত অরণ্য নগর পল্লি ভেদ করিয়া মহা-কল্লোলে সমুদ্র সমাগম জন্য প্রধাবিত হইতেছে, তখন ইহারা যাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—যাঁহা হইতে বল বিক্রম সকলই লাভ করিয়া যথা নিয়মে অবস্থান ও সঞ্চরণ করিতেছে, সেই মুল কারণ মূল শক্তি মূলাধার মহান্ পুরুষের মহদ্ভাব কাহার না হৃদয়ঙ্গম হয়? যাঁহার সেই অসীম জ্যোতির এক স্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারা ধূমকেতু সকলকে প্রজ্বলিত করিয়াছে, যাঁহার বল বীর্য্যের অনুমাত্র পর্ব্বত সাগর বিদ্যুৎ বজ্র

ধারণ করিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেছে, তখন সেই জ্যোতির জ্যোতিঃ আদি শক্তি মহাবল বিশ্বকার্য্যের কারণ পরব্রহ্মের মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়া কাহার শরীর না রোমাঞ্চিত হয়? কোন্ আত্মা না স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" বলিয়া স্তব করিতে থাকে?

মহানের সহিত ক্ষুদ্রের এমনি সম্বন্ধ, যে মহৎ বস্তু দেখিলে ক্ষুদ্র পদার্থ আপনা হইতেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে। মহান্ সূর্য্যের আকর্ষণ প্রভাবে পৃথিবী তাহার অনুগত হইয়া রহিয়াছে, নদ নদী সকল মহা সমুদ্র অভিমুখে ধাবিত হইতেছে; মহাপ্রতাপশালী রাজার সন্নিধানে হীন বল প্রজাদল বশীভূত হইয়া রহিয়াছে; আমারদিগের ক্ষুদ্র জীবাত্মা সকল সেই অজর অমর মহান্ আত্মার মহত্ত্ব ও অমৃতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আপনা হইতেই তাঁহার পদানত হইতেছে। তাঁহাকে "সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" জানিয়া তাঁহারই আজ্ঞাধীন হইয়া রহিয়াছে।

সহজ-জ্ঞান, আত্ম-প্রত্যয়-প্রভাবে যে পূর্ণ জ্ঞান পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়া, মনুষ্য আপনাকে অপূর্ণ ও পরতন্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, বহির্জ্জগতে তাঁহারই মহান্-ভাব মহতী শক্তি দুর্নিবার্য্য শাসন-প্রণালী প্রত্যক্ষ করিয়া আপনা হইতেই তাঁহার শরণাগত হয়। সেই জন্য পৃথিবীর সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব জাতি মধ্যে, সকল সময়েই সমগ্র মানবকুল পরমেশ্বরের মহীয়সী কীর্ত্তি কলাপ সন্দর্শন করিয়া এবং আপনাদের লঘুত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করত ভয় বিস্ময়ে তাঁহারই পূজা, তাঁহারই সেবা করিয়া আসিতেছে। জ্ঞান চক্ষুর অপরিস্ফুট অবস্থাতে যখন এই সমুদায় জড় আবরণ ভেদ করিয়া সেই মূল শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সর্ব্বভূতে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিতে সমর্থ হয় নাই, তখনও বিস্মিত চমৎকৃত হইয়া প্রাণহীন চন্দ্রসূর্য্য, অনল সাগর প্রভৃতি প্রকাণ্ড পদার্থ সকলকে মহান্ ঈশ্বর বোধে পূজার্চ্চনা করিয়াছে। কালক্রমে মনুষ্যের যত জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত

হইতেছে, ততই " সর্ব্বভূতে শরীর মধ্যে গূঢ়রূপে " সেই অন্তরতম মহান্ পুরুষের সত্তা অনুভব করিয়া মানব আত্মা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতির সহিত তাঁহার পূজায় অগ্রসর হইতেছে। অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে তাঁহারই পিতৃ ভাব, মাতৃ স্নেহ, কল্যাণ লক্ষ্য উপলব্ধি করিয়া অমূলক ভয়, অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আন্তরিক অনুরাগ, অবিচলিত প্রেমের সহিত তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছে।

ভীষণ আকার উগ্রমূর্ত্তি মহান্ পদার্থ সকল যেমন মানব-হৃদয়কে ভয় বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তাহার অনুগত করিয়া ফেলে, তেমনি আবার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব, মানব-আত্মাকে প্রীতি সদ্ভাবে শ্রদ্ধা অনুরাগে সমুন্নত করিয়া তোলে। যখন সূর্য্য জ্যোতিকে কেবল দিক্‌দাহ করিতে দেখি, যখন বিদ্যুৎ বজ্র নিনাদে জীব জন্তুকে কম্পিত ও নিহত করিতে অবলোকন করি, নদী সাগরকে নগর গ্রাম সমুদায় প্লাবিত ও বিনষ্ট করিতে দর্শন করি, তখনই তাহাদিগকে ভয়ানক বলিয়া অবগত হই, তখনই তাহারদিগকে দর্শন মাত্রেই ভীত হই। কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, যে সূর্য্য আলোক প্রদান না করিলে, ওষধি বনস্পতি বর্দ্ধিত হয় না, শরীরের উত্তাপ রক্ষা পায় না, মেঘ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না, তখন কেমন আপনা হইতেই সূর্য্যের প্রতি প্রীতি-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। যখন জানিতে পারি যে, বজ্র বিদ্যুৎ দ্বারা বায়ু বিশোধিত হইতেছে, বিদ্যুৎ বলে অত্যল্প কাল মধ্যেই সমগ্র ভূমণ্ডলের সংবাদ সংগৃহীত হইতেছে, অনিষ্ট অকল্যাণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই গভীর নিনাদ, অসামান্য দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে, তখন আপনা হইতেই তাহার প্রতি আমারদিগের অনুরাগ ও আস্থা উপস্থিত হয়। যখন দেখি নদী সাগর না থাকিলে মেঘ-বাষ্পের সঞ্চার হয় না, বৃক্ষ লতা সমুৎপন্ন হয় না, বাণিজ্য কার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি হয় না, যখন বুঝিতে পারি যে তাহারা কেবল আমারদের কল্যাণ উদ্দেশেই ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছে, আমারদের শুভ উদ্দেশেই দিবারাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে. তখন হৃদয়

হইতে ভয় ও আশঙ্কার ভাব অন্তরিত হইয়া তৎপ্রতি আদর ও অনুরাগ উপস্থিত হইয়া থাকে। যে খানে সৌন্দর্য্য, সেই খানেই প্রীতি; যে খানে মঙ্গল-ভাব, সেই খানেই অনুরাগ। যেখানে কল্যাণ সেই খানেই আদর আস্থা আপনা হইতেই উদ্দীপ্ত হয়।

আমরা সহজ জ্ঞানেই স্পষ্ট জানিতেছি, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে ইহারা সমূদায়ই জড়পদার্থ। ইহারা আপনা আপনি উৎপন্ন হয় নাই, আপনা আপনি কিছুই লাভ করে নাই, কল্যাণ পূর্ণ পরমেশ্বরই ইহারদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি জগতের কল্যাণের জন্যই ইহাদিগকে বিবিধ গুণে, বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত করিয়া তাঁহার শুভ অভিপ্রায়, কল্যাণ লক্ষ্য সংসাধনে বিনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি এই সকল শক্তির মূল-শক্তি, সকল কারণের মূল কারণ হইয়া চেতন অচেতন সমুদায় পদার্থের অন্তর্ভূত থাকিয়া কল্যাণ বারি বর্ষণ করিতেছেন। তিনিই বজ্রে বল, সূর্য্যে জ্যোতি, চন্দ্রে শোভা, পর্ব্বতে গাম্ভীর্য্য, পুষ্পে সৌন্দর্য্য, প্রতি পদার্থে কল্যাণ সাধন উপযোগী নানা শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তিনিই মানব-আত্মাকে দয়া দাক্ষিণ্যে, স্নেহ প্রীতিতে, জ্ঞান-ধর্ম্মে অলঙ্কৃত করিয়া দিয়াছেন; তাঁহারই বলে সকলে বলীয়ান্, তাঁরই সৌন্দর্য্যে সকলে শোভমান হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

নদী স্রোত অবলম্বন করিয়া যেমন লোকে উৎস-মুখে উপনীত হয়, দীপ রশ্মি সন্দর্শন করিয়া যেমন পথিক প্রদীপ সন্নিধানে উপস্থিত হয়, ভূমির উচ্চতা অনুসরণ করিয়া যেমন পরিব্রাজক পর্ব্বত-চূড়ায় উত্থিত হইয়া থাকে; বিজ্ঞানময় আত্মা তেমনি জল স্থল আকাশে, ভূলোকে দ্যুলোকে, ক্ষুদ্র বৃহৎ তাবৎ পদার্থে ঈশ্বরেরই শক্তি, তাঁহারই জ্যোতি, তাঁহারই কল্যাণ ভাব, মঙ্গল লক্ষ্য উপলব্ধি করিয়া সেই মূল-কারণে উপনীত হয়। সমস্ত জড় আবরণ ভেদ করিয়া তখন সেই সত্য সুন্দর মঙ্গলের জীবন্ত আকরে উপনীত হয়। তখন সকল পদার্থে, সকল ঘট-

নায় সেই পিতারই অভয় হস্ত, সেই মাতারই স্নেহ দৃষ্টি প্রতীতি করিয়া নির্ভয় নিরুদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। তখন তাঁহা হইতে এ সকলই সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই প্রসাদে সকলই রক্ষা পাইতেছে, তাঁহারই নিয়মে সুখ শান্তি বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহারই প্রতি সমুদায় প্রীতির উৎস উৎসারিত হয়, জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট বলিয়া তখন সেই প্রীতি-স্রোত তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ইহার প্রতি প্রবাহিত হইতে থাকে। যখন জানিতে পারি যে তিনি কেবল জড় রাজ্যকে সুন্দর সুশৃঙ্খল রূপে রক্ষণ ও পালন করিতেছেন না, তিনি দূর দূরান্তরে থাকিয়া সমুদায় জড়জগতকে আমারদের কল্যাণ সাধনে নিয়োগ করিতেছেন না, তিনি আমার এই শরীরকে বলবীর্য্যে কৌশল-কলাপে সংরচিত করিয়া এই "শরীর মধ্যে গূঢ়-রক্ষা স্থিতি করিতেছেন।" তিনি আমার আত্মার অভ্যন্তরে জাগ্রত জীবন্ত রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া প্রতিক্ষণ ধর্ম্ম-বল ও শুভ-বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, তখন তাঁর সত্তা তাঁর আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নেত্র-যুগল অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকে। তখন হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে কৃতজ্ঞতার সহস্র উৎস তাঁরই প্রতি উৎসারিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে এই স্তুতি-বাক্য বিনির্গত হইতে থাকে যে, হে বিশ্ব কার্য্যের কারণ, ত্রিভুবন পরিপালক করুণাময় পিতা! আমি কে যে তুমি আমার জন্য সহস্রধারে অবিশ্রামে এত সুখ শান্তি বর্ষণ করিতেছ। আমি কোথাকার কীট যে তুমি আমার জন্য তোমার উদার সদাব্রত দ্বার প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছ? তুমি রাজার রাজা, দেবতার দেবতা হইয়া আমার উন্নতি উৎকর্ষ সাধন জন্য দিবারাত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ। নাথ! আমি তোমার আশ্রিত ক্ষুদ্র জীব, আমি তোমার দ্বারের ভিখারী, আমি তোমার অশেষ করুণা, অনুপম দয়ার কি প্রতিক্রিয়া করিব? আমার দেহ মন আত্মা সকলই তোমারই, তাহা তোমাকেই সমর্পণ করিতেছি তুমি গ্রহণ কর।

যখন ঈশ্বরের সেই নিত্য ভাব হৃদয়ে প্রকাশ পায়, যখন আত্মার অবিনশ্বর উন্নতিশীল প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আর পার্থিব সুখের প্রতি নির্ভর করিয়া আত্মা সুস্থির থাকিতে পারে না। যখন দেখি এখানকার সকলই অচির অস্থায়ী; এ সূর্য্যের কখন উদয়, কখন অস্ত; এখানে কখন পৌর্ণমাসী, কখন অমানিশা; কখন মধুর বসন্ত, কখন নিদারুণ গ্রীষ্ম। এখানে কখন আনন্দ উৎসব, কখন বিষাদ ক্রন্দন; কখন মিত্রতার আবির্ভাব, কখন শত্রুতার পরাক্রম। তখন আর এ সংসার-প্রেমে চির-মুগ্ধ থাকিতে কার ইচ্ছা হয়? তখন কার হৃদয় না যেখানে রোগ শোক জরা মৃত্যুর অধিকার নাই, যেখানে বিষাদ ক্রন্দনের আশঙ্কা নাই, যেখানে চির বসন্ত চির-সুখ চির-সৌন্দর্য্য সেখানে যাইতে উৎসুক হয়। তখন কার আত্মা না সেই অজর অমর ধ্রুব-শান্তি-নিকেতনে যাইতে ব্যাকুল হয়। এই মর্ত্ত্য-লোকে চির-সুখ চির-শান্তির অভাব দেখিয়া কোন্ আত্মা না সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল পরমেশ্বরের সন্নিধানে এই প্রার্থনা করে "অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যো র্মামৃতং গময়!"

ইহ লোকের করুণা বিতরণে সেই সত্যকাম মঙ্গল-সঙ্কল্প পরমেশ্বরের করুণার পরিসমাপ্তি হয় না। ইহ-জীবনের কল্যাণ-দানে তাঁহার দান-ক্রিয়ার পরিশেষ হয় না। তিনি নিত্য নূতন সুখ, নিত্য নূতন আনন্দ বিধান করিয়া আত্মার অমৃত লালসা পরিবর্দ্ধন করিতেছেন। তিনি সুখের উৎস, শান্তির প্রস্রবণ অমৃতের আকর। "সেই বিশ্বের একমাত্র পরিবেষ্টিতা পরমেশ্বরকে জানিয়া লোক সকল অমর হয়েন।"

হে সুধীর সাধু সজ্জন সকল! ঈশ্বর "আপনার বিশুদ্ধ মঙ্গল স্বরূপ এই তাবৎ ভৌতিক পদার্থে এবং মনুষ্যের মানস-পটে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছেন।" অসীম সমুদ্রে, উন্নত পর্ব্বতে, অনন্ত আকাশে তাঁহার মহান্ ভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হও।

অসীম চরাচরে তাঁহার মঙ্গল ভাব শুভ সংকল্প দেদীপ্যমান দেখিয়া সমুদায় হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতি কর। আপনার জীবনে তাঁহার স্নেহ করুণা মূর্ত্তিমতী দেখিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আপনার আত্মাতে তাঁহার আবির্ভাব ও অধিষ্ঠান অনুভব করিয়া তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ কর। আপনাকে অমৃত-ধামের অধিকারী জানিয়া তাঁহার প্রসাদ লাভের জন্য তাঁহার নিত্য পূজা নিত্য উপাসনায় প্রবৃত্ত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

——০——

অষ্টম উপদেশ।

৮ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৭৯১ শক।

ধর্ম্মং চর ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।

ধর্ম্মাচরণ কর ধর্ম্মের পর আর নাই।

যে ধর্ম্ম লাভ না করিলে আমরা কখনই সুখ ও শান্তি ভোগ করিতে পারি না, তাহা কি প্রকারে সাধন করিব—কি প্রকারে তাহা আমাদের জীবনের অঙ্গ স্বরূপ হইবে তাহা আমাদের অন্তরাত্মা বলিয়া দিতেছে। আমরা দেখিতেছি যে দৃঢ় ও সংযত হইয়া কতকগুলি নিয়ম অবলম্বন না করিলে আমরা ধর্ম্মের পথের পথিক হইতে পারি না। আমাদিগের স্বভাব, চিন্তা, বাক্যে ও কার্য্যে সকলের প্রতি সাবধানতা সহকারে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কখন্ কোন্‌টি অপথে পদার্পণ করিতেছে। যখন আমরা ঈশ্বরোপাসনাতে নিযুক্ত থাকি তখন মনে করি যে ঈশ্বরকে কখনই পরিত্যাগ করিব না, তাঁহাকে মনে মনে নয়নে নয়নে রাখিয়া সংসারে বিচরণ করিব কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আমাদের রসনা লোকের নিন্দাবাদে হঠাৎ প্রবৃত্ত হয়—অন্যায় চিন্তা, দ্বেষ, হিংসা হঠাৎ হৃদয় অধিকার করে—সামান্য বিষয়ে অনুরাগ ও চাঞ্চল্য জন্মে ও স্বার্থের দিকে দৃষ্টি হইয়া আমাদের আত্মা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

আমরা কি ঈশ্বর ও ধর্ম্মকে সকল কালে সঙ্গের সঙ্গী করিয়া রাখিতে পারিব না ? আমরা কি উপাসনালয়ে এক রূপ ও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অন্য রূপ মনুষ্য হইব ? সংসারে—কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আমাদের অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হয় অতএব যদি আমরা সেখানে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা না রাখিয়া প্রবৃত্তি বিশেষ দ্বারা চালিত হই—ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই তবে আমাদের আর কি হইল ? আমরা ঈশ্বরের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া, ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সংসারে প্রবেশ করিব—বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া বিষয় প্রলোভনে পতিত হইয়া একটিও অন্যায় কার্য্য ও অন্যায় চিন্তা করিব না—ইন্দ্রিয় লালসাকে হৃদয়ে স্থান দিব না অসত্য বলিব না যে সকল লোকের সহিত মিলিত হইব তাহাদের গুণ গ্রহণে ও সমাদরে যত্নবান থাকিব—তাহাদের দোষানুসন্ধানে রত থাকিব না সকলের দোষ বিনম্র চক্ষে দর্শন করিব—মনে করিব যে দোষি ব্যক্তির অবস্থায় পতিত হইলে আমরাও প্রলোভনের দাস হইয়া তাহার ন্যায় দোষী হইতে পারিতাম বিশেষতঃ আমরা জীহ্বাকে অসৎ ও নিরর্থক আলাপ ও কথাবার্ত্তা হইতে বিরত রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্টিত থাকিব। জল্পনা দ্বারা বিশেষ কি হানি হইবে ইহা মনে হইতে পারে বটে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে আমাদিগের চিত্ত যদি অসার না হইত তাহা হইলে অসার বিষয়ে কথোপকথনে আমাদের প্রবৃত্তি হইত না লোকের অনুরোধে বা সমাজের প্রথানুসারে ঐরূপ কথার আমোদে প্রবৃত্ত হইলে আমাদের চিত্তও ক্রমে অসার ও ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাৎ।" যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব।

এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য যেন আমাদের হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকে। মধ্যে মধ্যে সাবহিত রূপে আত্ম জিজ্ঞাসা করা একান্ত আবশ্যক। আমরা কি কার্য্য করিতেছি কোন্ বিষয় চিন্তা করিতেছি—কি কি বিষয় লাভের জন্য মন উৎকণ্ঠিত ও ধাবিত হইতেছে আত্মার গভীরতম প্রদেশে কিসের অভাব আছে ?—

যাঁহাকে দেখিলে "এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি" তাঁহাকে পাইয়া আত্মা কেন বীতশোক হয় নাই? তাঁহাকে পাইয়া তাহার সকল অভাব কেন বিদূরিত হয় নাই? পরমানন্দ. লব্ধ ও পরমলোক প্রাপ্ত হয় নাই? ইহা স্থির চিত্তে প্রনিধান করিয়া দেখা উচিত। অনেকের মনে কোন একটী বিষয়ের প্রতি এ রূপ আসক্তি থাকে যে তাহারা অবকাশ পাইলেই তাহাদের সেই প্রিয় বিষয়ের ধ্যানে নিমগ্ন হয় ও তাহারই আলোচনাতে সুখানুভব করে, হা! আমাদের সম্বন্ধে সেই বিষয়টীই যদি ঈশ্বর হন তাহা হইলে আমাদিগের কি অপার সুখ ও তৃপ্তির কারণ হয়। আমরা যে বিদ্যা উপার্জ্জন করি তাহাতে কত দূর তাঁহার জ্ঞান লাভ হইল ইহাই যেন আমাদের লক্ষ্য থাকে তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা যেন কোন চিন্তা আলোচনা ও অনুষ্ঠান না করি। আমাদের মন অবকাশ পাইলেই যদি তাঁহার অপার মহিমা ও করুণা ও প্রেম চিন্তনে রত হয় ও তাঁহাকে পাইয়া আমাদের যদি বিপুলানন্দ লাভ হয় তাহা হইলে অন্যায় চিন্তা মিথ্যা প্রভৃতি কি আমাদিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে? কবে আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের ধন জানিয়া তাঁহাকে হৃদয় মন সমর্পণ করিব? কবে পবিত্র হৃদয়ে তাঁহাকে আত্মাতে সমাসীন দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও প্রেম ভরে পূজা করিব—কবে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মের সোপানে ক্রমে উত্থিত হইতে থাকিব?

হে ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর! তুমি আমাদের আত্মাকে কি আশ্চর্য্য প্রীতি ও স্নেহ সহকারে তোমার মাতৃক্রোড়ে আহ্বান করিতেছ! তুমি প্রতিনিয়ত বলিতেছ "বৎস" এখানকার মায়ায় বিমোহিত হইও না আমার আদেশ বলিয়া সংসারের কার্য্য কর। আমারদিকে চাও আমি বিষয়রস অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও তৃপ্তিকর আমার প্রেমামৃত প্রদান করিব যাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইবে, আমার নিকট বল চাও আমি তোমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিব ও পৃথিবী হইতে চিরকালের সম্বল যে

অমূল্য ধর্ম্ম ধন, তাহা সঞ্চয় করিয়া আমার সুখশান্তি পূর্ণ ধামে আইস ! ! যতক্ষণ আমরা তোমার এই স্নেহময় সুমধুর বাক্য শ্রবণ করি ততক্ষণ প্রকৃত জীবন লাভ করি—ততক্ষণ অমৃত-ধামের প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই জন্য উপযুক্ত হইতে থাকি—ততক্ষণ মোহ, শোক, তাপ চলিয়া গিয়া আমরা ধর্ম্ম পথে চলিতে থাকি। হে করুণাময় ! তোমার সঙ্গে থাকিয়া যে ক্ষণমাত্র নিত্য সুখ প্রাপ্ত হই তাহা তুমি চিরস্থায়ী কর যাহাতে সম্পূর্ণ রূপে তোমার শরণাপন্ন হইয়া তোমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি তুমি আমাদিগকে তদুপযোগিনী শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

—o—

নবম উপদেশ।

৯ মাঘ শুক্রবার ১৭৯১ শক।

"যোবৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ।"

যথায় মহত্ত্ব, তথায় সুখের অবস্থান; ক্ষুদ্রতায় সুখ নাই। পরমেশ্বর পরাৎপর তিনি মহত্ত্বের আকর, সুতরাং সুখ স্বরূপ; অতএব প্রকৃত সুখ লাভের বাঞ্ছা করিলে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে চেষ্টা করিবেক।

সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের মহিমা অতুল। কি জ্ঞান বিষয়ে কি শক্তি বিষয়ে কি মঙ্গল ভাবে সকলেতেই তিনি অদ্বিতীয়। তাঁহার মহান্ ভাবের সীমা নাই। এই বিচিত্র কৌশলময় জগৎ সৃজন ও পালনে তাঁহার কি আশ্চর্য্য জ্ঞান কি অদ্ভুত শক্তি কি অনুপম মঙ্গল ভাবই প্রকাশ পাইতেছে! সেই অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হস্ত ব্যতীত আর কোন্ হস্ত এমত অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি

লোক সকল আকাশপথে স্থাপন করিতে পারে? সেই অনন্ত-শক্তিধর ভিন্ন আর কে এই প্রকাণ্ড ব্রাহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া রাখিতে পারে? সেই অনন্ত জ্ঞানাপন্ন নিয়ন্তা ব্যতিরেকে কে তাহাদিগকে এমত নিয়মে রাখিতে পারে যে, কেবল পরস্পরের আকর্ষণে পরস্পর বিনা প্রমাদে শূন্যে আলম্বিত থাকিতে সমর্থ হয়। আমরা যে এই পৃথিবীতে বসতি করিতেছি, ইহার আকৃতি ও বিস্তৃতি মনে হইলে কেমন বিস্মিত হইতে হয়! তখন ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বৃহৎ কত কত গ্রহ নিয়ত আকাশে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা স্মরণ করিলে সেই বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির বৃহত্ত্ব আমরা কি কল্পনায় ধারণ করিতে পারি? সমস্ত জগতের তুলনায় এই পৃথিবী যে একটী ক্ষুদ্রগ্রহ ইহারই মধ্যে কত আশ্চর্য্য পদার্থ, কত আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাদিগকে আশ্চর্য্যার্ণবে নিমগ্ন করে। ইহার পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্রের গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি দেখিয়া আমাদের মন কেমন প্রশস্ত হয়! আমাদের সৌর জগতের স্তম্ভস্বরূপ যে সূর্য্য, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া সমস্ত জড়, উদ্ভিদ্, শরীরীদিগের সম্বন্ধে প্রাণ রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সেই সূর্য্য আমাদের পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চতুর্দ্দশ লক্ষগুণে বৃহৎ। এমত কত কত সূর্য্য ও কত কত সৌরজগৎ আছে, তাহার সংখ্যা অদ্যাপি মনুষ্য দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই সমস্ত অসংখ্য সৃষ্টি সেই পরম কারুণিক পুরুষের এক ইচ্ছার বলে রচিত হইল। এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেই মহান্ পুরুষের হস্তের চিহ্ন দেদীপ্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার মহিমা কোথায় না প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; সেই মহিমা যেমত আকাশপথের প্রকাণ্ড লোক মধ্যে স্থিতি করিতেছে, সেই রূপ আবার সামান্য একটী বৃক্ষ পত্রে, একটী বালুকারেণুর মধ্যে উজ্জ্বলরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। চক্ষু উন্মীলন করিয়া যথা চাই যথা যাই তথাই তাঁহার মহিমা। চারি দিক তাঁহার মঙ্গল গীতে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত অসংখ্য লোক জীবন ও সুখে পূর্ণ রহিয়াছে। একটী মুকুল অথবা এক

বিন্দু জলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর তাহা অসংখ্য জীবে পরিপূরিত দেখিবে। তবে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডে যে কত জীব আছে তাহার সংখ্যা কোন্ কল্পনায় ধারণ করিতে পারে? এই সমস্ত প্রজার একা তিনি প্রজাপতি এই সমস্ত লোকের একা তিনি অধিপতি। এই অনন্ত কোটি লোকের অনন্ত কোটি জীবকে তিনি আপন শাসনে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছেন। পৃথিবীস্থ কোন রাজা যদি পরিমিত কতকগুলি রাজ্য আপন অধীনে রাখিয়া সুপ্রণালী পূর্ব্বক রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন তবে তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বিমোহিত হই, এখানকার যদি কেহ আপন প্রখর ধীশক্তির বলে জ্ঞানের কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি আমাদের বহুপ্রশংসার ভাজন হয়েন, যদি কেহ মর্ত্ত্য লোকের পরিমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন এবং যদি তাহারই কিঞ্চিৎ অংশ দুঃখী দরিদ্র ব্যক্তিগণের অভাব মোচনার্থে প্রয়োগ করেন তবে তাঁহার বদান্যতাগুণে আমরা পক্ষপাতী হই। আমরা এই সকল গুণকে মহৎ বলিয়া ব্যাখ্যা করি। কিন্তু তিনি বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বপাতা তাঁহার কেহ দ্বিতীয় নাই, তাঁহার শক্তি দ্বারা বিধৃত হইয়া এই সমস্ত জীবন ও সুখ পূর্ণ লোক মণ্ডল স্থিতি করিতেছে এবং সেই শক্তি এক মুহূর্ত্তকালের জন্য বিরাম পাইলে সমস্ত লোক এককালে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান প্রভাবে কত কাল হইতে স্থষ্টির আশ্চর্য্য ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়া আসিতেছে; এক মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার ব্যতিক্রম বা বিপর্য্যয় উপস্থিত হয় না; তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই প্রতি দিন প্রতি মুহূর্ত্তে অনন্তকোটি জীব তাঁহার সদাব্রতের ফলভোগী হইয়া তাঁহার অক্ষয় ধনের কিঞ্চিৎ হ্রাস করিতে পারে না, তাঁহার দয়া ও মঙ্গল ভাবের কোথায় উপমা পাইব। যিনি এই সমস্ত সুখকর স্থষ্টি বাধ্য হইয়া রচনা করেন নাই কিন্তু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কেবল সুখ দানের জন্য উৎপন্ন করিলেন, তিনি কি অনন্তগুণে মহৎ নহেন? তাঁহার মহত্ত্বের সীমা কে করিতে পারে? তিনি মহত্ত্বের আকরস্বরূপ

তিনি " মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ, " তিনি মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। সুখ তাঁহাতে ওত প্রোত হইয়া আছে।

আমাদের স্বভাবনিহিত যে সকল বৃত্তি ও স্পৃহা আছে তাহাদের যথোচিত চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারিলে. উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে যথাযোগ্য প্রাধান্য প্রদান করিয়া অন্যান্য বৃত্তি সুচারু রূপে চালনা করিতে পারিলে আমাদের সুখোৎপত্তি হয়। আমাদের নানা প্রকার অভাব আছে তৎসমুদয় বিদূরিত করিতে পারিলেই আমরা সুখী হইতে পারি। পরমেশ্বরের কোন অভাব নাই তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের স্বামী, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তাঁহার যাহা ইচ্ছা—যাহা সঙ্কল্প, তাহাই তাঁর কার্য্য অতএব তিনি সুখ স্বরূপ, তিনি মাহান্ আত্মা সকলের প্রভু।

সেই ভূমা ঈশ্বরের মহান্ ভাবের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, তিনি জ্ঞানেতে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, তিনি রাজাধিরাজ মহারাজ তথাপি তিনি সামান্য কীটের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন। তিনি পবিত্রস্বরূপ, তিনি পবিত্রতার নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তথাপি তিনি ঘোরতর পাপীকেও আপন সন্নিধানে যাইতে দেন। তিনি এই আশ্চর্য্য রূপ মঙ্গল ভাবে মহৎ বলিয়া তাঁহার মহত্ত্বের এত মধুরতা হইয়াছে। মনুষ্যের পক্ষে এ মহৎভাবের কণাও সম্ভবে না। যদি কেহ তাঁহার ভ্রাতা অপেক্ষা জ্ঞানেতে কিঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করেন, তবে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অনেক স্থলে হয়ত তিনি তুচ্ছ নয়নে দেখিতে থাকেন। হায়! ক্ষুদ্র পরিমিত মনুষ্যের আশ্রয় লইলে কত বারই আমাদের আঘাত পাইতে হয়। কিন্তু সেই পরাৎপরের শরণ লইলে আমরা কেমন অভয় লাভ করি, কেমন বীতশোক হই। " হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ "। মহদাশ্রয় লাভ করিতে পারিলে হৃদয়ভার তিরোহিত হইয়া হৃদয় প্রফুল্লিত হয়। মহদাশ্রয়ের যে কি গুণ তাহা বাক্যে বলা যায় না। সেই মঙ্গলস্বরূপের মহান্ ভাবের কিঞ্চিৎ আভাস যেখানে পতিত হয় তাহা কি শোভা-

ময় ও সুখময় হয়। যে মনুষ্য সেই মহান্ ভাবের আভাস কিঞ্চিৎ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন তিনিই ধন্য হয়েন, তিনি সুখে কাল যাপন করিতে থাকেন। দেখ আমরা একটী পরিমিত মঙ্গল কার্য্য করিতে পারিলে আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করি তদ্দ্বারা আমরা একটী নির্ম্মল সুখ অনুভব করি। আমরা যদি ক্ষুধার্ত্তকে এক মুষ্টি অন্ন দিতে পারি, রোগীকে ঔষধ ও শুশ্রূষা দ্বারা যদি তাহার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব করিতে পারি, অজ্ঞানকে যদি কিঞ্চিৎ জ্ঞান দিতে পারি, তাহাতে আমরা কেমন তৃপ্ত হই। সেই সকল কার্য্য মহৎ বলিয়া পরিগণিত হয়। তবে যিনি অসংখ্য জীবের প্রাণ দান করিলেন, যিনি তাহাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন, নিয়তই যিনি তাহাদের কাম্য উপভোগ প্রদান করিতেছেন, সুখ সৌভাগ্য বিধান করিতেছেন, নানাপ্রকার বিপদ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে রক্ষা করিতেছেন, আপন মঙ্গল পথে আনয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কত অনন্তগুণে মহৎ এবং কত অনন্ত সুখেই সুখী আছেন তাহা অনুধাবন কর।

তিনি সমস্ত সুখের প্রস্রবণ স্বরূপ, সেই প্রস্রবণ হইতে নিরন্তর সুখরস উৎসারিত হইয়া সমস্ত বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে। সেই সুধামৃত বিশিষ্ট রূপে পান করিয়া দেবলোক নিবাসীগণ অমর পদে অধিরূঢ় হইতেছেন। এবং ইহলোকের সমস্ত ভূচর, জলচর, খেচর, সামান্য পতঙ্গ কীট এবং কীটাণু পর্য্যন্ত সকলে সেই সুখের কণা মাত্র লাভ করিয়া সুখ সম্ভোগে জীবন যাপন করি-তেছে। দেবতারা ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বতন্ত্র ভাবে সজ্ঞানে পরম সুখ আস্বাদন করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইতেছেন এবং ভূলোকের ইতর প্রাণীগণ অন্ধভাবে অজ্ঞানের সহিত সেই সুখকণা লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থানুসারে সুখী হইতেছে। মনুষ্য দুই প্রকৃতি বিশিষ্ট তাঁহাতে দেব প্রকৃতি ও পশু প্রকৃতি আছে। যখন তিনি পশু প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া স্বল্প সুখ ভোগে নিযুক্ত হয়েন তখন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না, কারণ তিনি অমৃতের অধি-

কারী; এই হেতু তাঁহার অন্তরে নিহিত দেবভাব মহান্ সুখের অভাবে তাঁহাকে ব্যাকুলিত করে। কেহ যদি আপনার সমযোগ্য অথবা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া কালযাপন করিতে পারেন, তবে তাঁহার মনে কি আহ্লাদের উদয় হয়; কিন্তু তদ্বিপরীতে, যদি নীচাশয় ব্যক্তির সহিত সংযুক্ত হয়েন, তবে তাঁহাকে অসুখ ও অতৃপ্তি কেনই না ভোগ করিতে হইবে। মনুষ্যের আত্মা ক্ষুদ্র নহে, ইহা অবিনাশী এবং সেই মহান্ পুরুষ যিনি সকলের প্রভু, তাঁহারই পুত্র; অতএব ক্ষণভঙ্গুর অতি ক্ষুদ্র বিষয়ের যোগে কেমন করিয়া তাহার তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা; ক্ষণভঙ্গুর সুখ তাহার পক্ষে সুখই নহে। হে মানব! তুমি সুখানুসন্ধানে কি না করিতেছ, আহা! দীপ্তশিরার ন্যায় কোথায় না ভ্রমণ করিতেছ, সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষায় কত কষ্টই না বহন করিতেছ, কত দুঃসাহসিক ক্রিয়াতেই না রত হইতেছ। সেই সুখের জন্য ভীষণ রণস্থলে যাইতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেছ না, কিন্তু কি পরিতাপ, একটী মহাভ্রমে পতিত হইয়া তাহা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছ না। সুখ কি মর্ত্ত্য পদার্থ যে মর্ত্ত্য বস্তুর মধ্যে তাহা পাইবে? কৈ এত আড়ম্বরান্বিত রাজভবনে ইহার অধিষ্ঠান তো দৃষ্টিগোচর হয় না; অথবা ভূগর্ভস্থ রত্নখনির মধ্যে ইহাকে পাওয়া যায় না। কৈ প্রভুত্বের উচ্চ সোপানে ইহার তো বসতি নহে, বিদ্যার প্রতিষ্ঠা-পুষ্প মাল্যে ইহার সৌরভ পাওয়া যায় না। ইহা স্বর্গীয় রত্ন। ইহাকে মর্ত্ত্যলোকে লাভ করা অতি দুষ্কর, কেবল হৃদয়কে বিকশিত করিতে পারিলে সুলভে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখ যে, যে সকল ক্ষুদ্র পদার্থে আমরা সতত নিযুক্ত থাকি তাহাতে সুখ আছে কি না। ঐ দেখ কত উদ্যমের সহিত শত শত ব্যক্তি ধনের পশ্চাতে গমন করিতেছেন, মনে করিতেছেন, তাহা লাভ করিতে পারিলে সকল কামনা পূর্ণ হইবে; এই আশাতে অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু হা! সেই ধন যখন তাঁহাদের হস্তগত হইল তখন তাঁহারদের আশানুযায়ী কি সুখ লাভ লইল?

কিছুই না। হৃদয় পূর্ব্বে যেমন শূন্য ছিল, এখনও সেই রূপ রহিল; অধিকন্তু এক্ষণে কেবল ধন রক্ষায় উদ্বেগ এবং ধন ক্ষয়ের ভয়ই বাড়িল। আর যাঁহারা ধন লাভে কৃতকার্য্য হইলেন না তাঁহাদের তো কথাই নাই, তাঁহারা শোকে অভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে যাঁহারা প্রভুত্বের উচ্চ স্থানে বিচরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তথায় উপনীত হইয়া সুখরত্ন লাভ করিব এই আশা হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং আপনাদের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য অশেষ আয়াসে পরিপাটী রূপে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাই-লেন, তাহা শোভনতম দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিলেন, সমসজ্জীভূত বহু-সংখ্যক আজ্ঞাবহ ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন, এবং অর্থক্রীত চাটুবাদী সহচরগণকে সদা সমভিব্যাহারে রাখিলেন, তাঁহারাও এবম্বিধ উপায় দ্বারা অভিলষিত সুখলাভে অসমর্থ হইলেন। যাঁহারা সম্মানই সমস্ত সুখের আবাসস্থান জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন; যে কোন উপায় দ্বারা সম্মান সংগ্রহ করিতে পারা যায় তাহাতে যত্ন-বান্ হইলেন, তাঁহারদেরই বা কি অবস্থা ঘটিল, তাঁহারা কি অভি-প্রেত সুখরত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলেন? কেমন করিয়া তাহা সম্ভাবিত হইতে পারে। যখন লোকের প্রশংসা বায়ুর সমান চঞ্চল, যখন এই কুটিল পৃথিবীতে নিন্দাবাদ প্রশংসার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছায়ার ন্যায় গমন করে এবং যখন প্রশংসোপজীবী জনগণ আন্তরিক গুণে তাদৃশ বিভূষিত নহেন, বাহ্যাড়ম্বরই যখন তাঁহাদের সর্ব্বস্ব তখন তাঁহারা কি রূপে এতাদৃশ উপায় দ্বারা সুখী হইতে পারেন। তাঁহাদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম ও কর্ত্ত-ব্যের আদেশানুসারে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে লোকের হিতে আপ-নাদের দেহমন সমর্পণ করিলেন, কিন্তু কৃতঘ্ন পৃথিবী তাহার কি প্রতিক্রিয়া করিল, একবার তাঁহাদিগকে মুখে ধন্যবাদও দিল না। হায়! অনেক স্থলে এতাদৃশ মহাত্মাদিগের নির্যাতন করিল এবং স্থল বিশেষে প্রাণ হনন করিতে ত্রুটি করিল না। সত্য বটে, ইহাঁরা মর্ত্ত্য প্রশংসা লাভের ইচ্ছুক হইয়া কোন কার্য্যে রত হয়েন নাই;

সত্য বটে, ইহাঁরা যাহার প্রার্থী তাহা তাঁহাদিগের পিতা তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন; সৎকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার যে আত্মপ্রসাদ তাহা তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, পিতার প্রসন্ন মুখ ও আশীর্ব্বাদোত্থিত হস্ত দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, কিন্তু যখন এতাদৃশ মহৎ ব্যক্তিগণ পৃথিবীর আদরণীয় হইতে পারিলেন না,তখন লঘুচিত্ত প্রশংসাপ্রয়াসী ব্যক্তিগণ কি রূপে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া সুখী হইতে পারিবেন। যাঁহারা বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে সুখী করিবেন এই অভিপ্রায়ে অপরা বিদ্যার নানা শাখা প্রশাখা অধ্যয়ন করিলেন, নানা বাহ্যবস্তুর গুণ শক্তি ক্রিয়া এবং সম্বন্ধ উত্তম রূপে বুঝিলেন, মনের বিষয় সকল আলোচনা দ্বারা মানসিক বৃত্তি মার্জ্জিত করিলেন এবং অপরা বিদ্যার নানা বিষয়ে তর্ক বিতর্ক এবং আন্দোলন দ্বারা অন্যের মন আপনাদিগের প্রতি আকর্ষণ করিলেন কিন্তু মূল উদ্দেশ্য যে সুখ লাভ করা তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইলেন, ধনমান ও অন্যান্য বিষয় হইতে যদিও ইহাতে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত ফল লাভ হইল, কিন্তু হৃদয়ের সমস্ত আশা ও ভাব পূর্ণ হইল না। যখন কোন একটি নূতন বিষয় জানিতে পারেন, নূতন সত্য অর্জ্জন করিতে পারেন অথবা নূতন মীমাংসা নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তৎকালে মনে হর্ষ উৎপন্ন হয় বটে কিন্তু তাহা গভীর ও স্থায়ী নহে। এবং প্রকৃতি ও অবস্থা ভেদে এমত দুরবস্থাও ঘটে যে, জ্ঞানের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সংসার-অন্ধকার আসিয়া তাহাদিগকে একেবারে অন্ধীভূত করিয়া ফেলে, তাহাদের বিড়ম্বনার আর সীমা থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি কেবল অপরা বিদ্যাকেই আমাদিগের শেষগতি মনে করি, তাহা হইলে এই রূপ অতৃপ্তি ও দুর্ভাগ্য আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। কিন্তু যদি অপরাবিদ্যাকে পরাবিদ্যার মঞ্চে উঠিবার সোপান স্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহাকে সীমা বিশিষ্ট করি, যদি মনোবৃত্তি মার্জ্জন করিবার সময় ধর্ম্মকে মনের অধিপতি করি, যদি ধর্ম্মরসায়ণ দ্বারা মনের সমস্ত কলঙ্ক নাশ করিয়া তাহাতে

নির্ম্মলতা প্রদান করিতে পারি, তাহা হইলে সেই অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যথেষ্ট সুখ লাভ করিয়া তৃপ্ত হই, তখন কোন সত্য উপার্জ্জন করিতে পারিলে সকল সত্যের সত্যকে দেখিয়া অপার সুখ অনুভব করিতে থাকি, তখন অপরা বিদ্যার জ্ঞাতব্য বিষয়ের অতীত সত্যকে অবলোকন করিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। অতএব শুদ্ধ অপরা বিদ্যা লাভে আমরা সুখী হইতে পারি না। এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে ঐহিক কোন বিষয়ই আমাদিগকে গভীর ও স্থায়ী সুখ প্রদানে সমর্থ নহে। সংসারের নিজের যাহা কিছু তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং অস্থায়ী, এবং সংসারের অতীত যে সকল সুন্দর পদার্থ আছে তাহাও সংসারের সহিত মিশ্রিত হইলে বিরূপ হইয়া যায়, সুতরাং তাহাদের সুখজনকতারও হানি জন্মে। প্রীতি ও সৌহার্দ্দ যে এমত মনোহর পদার্থ. যাহাদের অধিকারে সমস্ত ভুবন এক নবতর আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে, যাহাদের মধুরতা গুণে কঠিন মনও বিগলিত হইয়া যায়, সেই সুন্দর প্রীতি ও সৌহার্দ্দ যখন তাহাদের মূল ভূমি হইতে উৎপাটিত হইয়া সংসারে স্থাপিত হয়, তখন তাহাদের আদি রমণীয়তা থাকে না। এই হেতু সেই সকল আনন্দ-জনক উৎকৃষ্ট পদার্থ মর্ত্ত্য পদার্থে স্থাপন করিয়া অনেক সময় আমাদিগকে বিলাপ করিতে হয়। আজ যাহাকে মনের সম্পূর্ণ প্রীতি প্রদান করিলাম, যাহার মুখচন্দ্রমা দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইতে লাগিলাম, যাহার সহিত আলাপে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিতেছি বোধ হইল, যাহার জীবনে আমার সমস্ত আশা ভরসা স্থাপিত করিলাম, হায়! কল্য সে মৃত্যু মুখে পতিত হইল, এবং আমার কি দুরবস্থা উপস্থিত, আমার সমস্ত আশা সমস্ত ভরসা একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল, সমস্ত সুখ অসুখে পরিণত হইল, আমিও আমার প্রিয়তমের ন্যায় প্রায় হিম-কলেবর হইলাম প্রাণ মাত্র কেবল দেহে রহিল, এবং জীবনের অবশিষ্ট সময় কেবল বিষাদে ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম। সৌহার্দ্দরস যে এমত মধুময় তাহার সম্পূর্ণ সার্থকতা এই মর্ত্ত্য লোকে হয় না। কাহাকে প্রাণের সুহৃদ

বলিয়া গ্রহণ করিলাম, নিয়ত তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগি-লাম, সমস্ত হৃদয় তাঁহাতে সমর্পণ করিলাম, আমার সমস্ত বিশ্বাস তাঁহাতে অর্পিত রহিল, কিন্তু হায়! এমত ব্যক্তি যাঁহার নিকট হইতে সৌহার্দ্দ ভিন্ন আর কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারি না তিনিও বিপ-র্য্যয় সাধন করিলেন। হায়! তিনি আমার হৃদয়কে ভগ্ন করিলেন, তাঁহা কর্ত্তৃক আমি প্রতারিত হইলাম, এবং মনুষ্যের এমত আচরণ সম্ভাবনা জানিয়া বিষাদ বিস্ময়ে স্তব্ধভাবে নিমগ্ন রহিলাম। হায়! সংসারের এই রূপ ক্ষীণতা এই রূপ শোচনীয় ভাব। সংসার কেমন বাহিরে আপন সুখদায়কতা গুণ প্রকাশ করে, কত প্রলোভন আমাদিগকে দেখায়, কিন্তু ইহার অভ্যন্তর একেবারে শূন্যময়, ইহাতে এক বিন্দুও জল নাই যাহাতে আমাদের তৃষ্ণা কিঞ্চিৎ নিবারিত হইতে পারে। দূর হইতে দেখিলে ইহাকে এক সুন্দর বেশে ভূষিত দেখা যায়, ইহা সুখে পরিপূর্ণ বোধ হয়। কিন্তু ইহার সহিত যত পরিচিত হওয়া যায় তত ইহা অন্য রূপ ধারণ করে। দূর হইতে দেখিলে ইহা এক মনোহর উদ্যান বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়-মান হয়, যাহার মধ্যে সুবিশাল বৃক্ষ সকল শীতল ছায়া প্রদান করিতেছে, রসাল ফল বিশিষ্ট তরুলতা সুস্বাদু ফল ধারণ করিয়া আছে এবং নানা প্রকার পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে, দূর হইতে এই রূপ দৃশ্য আমাদের নয়ন মনকে আকর্ষণ করে, আমরা আগ্রহ সহকারে সেই সংসার উদ্যানে প্রবেশ করি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! প্রবেশ করিয়া দেখি যেন কোন ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপার দ্বারা সেই মনোহর দৃশ্য একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, বৃক্ষের শীতল ছায়ার পরিবর্ত্তে বিস্তীর্ণ তপ্ত বালুকাময় ক্ষেত্র প্রসারিত, সুস্বাদু ফলের পরিবর্ত্তে তিক্ত, কষায় ফল, এবং সুগন্ধ পুষ্প বৃক্ষের স্থলে কন্টকময় বৃক্ষ রহিয়াছে। দৃশ্যের এই রূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া তখন শিরে করাঘাত করিতে থাকি, এবং সংসার উদ্যান এই রূপ অরণ্যে পরিণত দেখিয়া হাহাকার করিতে থাকি। সংসার যে এত অঙ্গীকার করিতেছিল তাহার কিছুই না পাইয়া না

দেখিয়া এখন লুপ্ত বুদ্ধি হইতে হইল, কোথায় সুখ স্বস্তি পাইব না কোথায় বিষন্নতা ও হৃদয় জ্বালা উপস্থিত হইল, কোথায় শান্তি ও আরামের প্রত্যাশাপন্ন, না কোথায় প্রতিপদে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। সংসার বিচরণে এই রূপ যন্ত্রণা পাইয়া শরীর জীর্ণ হইল, মন অবসন্ন হইল, এবং সংসারের বাক্যে প্রতারিত হইয়া আমাদিগকে দিন যামিনী শোক করিতে হইল। এই অবস্থায় আমরা নৈরাশ সাগরে নিমগ্ন হইয়া একেবারে অভিভূত হই, তাহাতে নিরুৎসাহের তরঙ্গ উঠিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের নিশ্বাস রোধ করিতে থাকে। হা! একের প্রতি দৃষ্টির অভাবে আমাদের এই রূপ দুর্গতি উপস্থিত হয়। যদি ভূমা ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি করিতাম তবে আমাদের এই রূপ অবস্থা ঘটিত না। এই মুমূর্ষু অবস্থাতে আমাদের সেই পুরাতন পিতা স্নেহময়ী মাতা, যিনি চিরদিনই আমাদের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহারই মধুর বাক্য এক্ষণে ধীরে ধীরে শ্রুতি গোচর হইল। দেখ, তিনি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে বলিতেছেন "পুত্র শোক করিও না, বিষন্ন হইও না, সান্ত্বনা অবলম্বন কর, সংসারকে ত তোমার সুখের আলয় করিয়া দেই নাই, ইহা তোমার শিক্ষার স্থল, তুমি আমার নিকট আইস, তোমার সমস্ত আশা ভরসা পূর্ণ হইবে"। হায়! এই বাক্য আমাদের অন্তরে কত বারই উত্থিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা প্রমত্ত ছিলাম বলিয়া তাহা শুনিয়াও শুনি নাই, তাহা আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা সংসারের প্রতারণা জানিতে পারিয়া সেই মহা বাক্যের সত্য স্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, "নাল্পে সুখমস্তি" অল্প ক্ষুদ্র পদার্থে সুখ নাই সংসারের সমস্ত শূন্যময়। তবে চল, সুখ লাভের আকাঙ্ক্ষী হই, চল পিতার শান্তি নিকেতনে তাঁহার ধর্ম্ম রাজ্যে প্রবেশ করি। তিনি আমাদের জন্য যে কত সুখরত্ন তথায় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন তাহা বাক্যে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। অতএব আর শোক করিও না, অবিলম্বে সেই অমৃত ধামে গমন কর,

হৃদয় জ্বালা ত্বরায় নিবারিত হইয়া অপূর্ব্ব সুখ ভোগে এখনই শরীর রোমাঞ্চিত হইবে। তিনি আমাদের করুণাময় পিতা, তিনি তাঁহার কোন অবাধ্য সন্তানকেও পরিত্যাগ করেন না, ঘোরতর পাপীকেও আপন ক্রোড়ে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। অতএব পাপ তাপে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহা হইতে দূরে থাকিতে অভিলাষ করিও না। তিনি আমাদের করুণাময় পিতা, ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হও। পিতার নিকট সন্তানের গমন করা কেমন সহজ ও স্বাভাবিক। তাঁহাতে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া কেমন সুখকর। তিনি আমাদের করুণাময় পিতা, আমরা তাঁহারই সন্তান, তবে আমরা আমাদের পিতৃ সম্পত্তি হইতে সেই অমৃত ধামের অযুত অগণ্য রত্ন লাভে কেন বিমুখ হই। আমাদের ত বহু-তর অভাব বিদ্যমান অনুভব করিতেছি, সেই সকল অভাব দ্বারা আমরা ত প্রতি মুহূর্ত্তে পরিচালিত হইতেছি, তথাপি তাহা মোচন করিবার জন্য আমাদের পিতৃ সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি না করিয়া নীচা-শয় সংসারের ক্ষুদ্র বস্তুর জন্য কি লালায়িত থাকিব? হা! ইহলোকে যদি কেহ যথেষ্ট পিতৃ সম্পত্তি লাভ করিয়া সেই সাংসারিক ঐশ্বর্য্য অনবধানতা প্রযুক্ত অপব্যয় করেন এবং পরে তজ্জন্য যখন অতি কষ্টে পতিত হয়েন, মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র পরিধান এবং কায় ক্লেশে উদর পোষণ করিয়া অতিশয় বিষন্ন ভাবে কাল যাপন করেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আমরা কেমন দুঃখিত হই, তাঁহাকে আমরা কৃপা পাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। তবে আমরা সেই ব্যক্তি অপেক্ষা শত সহস্র গুণে কি কৃপা পাত্র নহি, আমাদের অবস্থা তাঁহার অপেক্ষা কি অধিকতর রূপে দৈন্য নহে; আমরা পরমপিতার অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া এবং সংসারের ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া দিন যামিনী কেবল দীন ভাবে শোক করিতেছি। হা! আর কেন, সেই পিতার আশ্রয় গ্রহণ কর, অপার শান্তি লাভ করিতে পারিবে। সেই পূর্ণ মঙ্গল সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার নিকট প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণ নির্ভর কর, কোন অভাবই থাকিবে

না। তাঁহার আনন্দ জনক-উৎসাহকর আনন দর্শন কর, সংসারের সমস্ত নিরুৎসাহ নির্ব্বীর্য্য ও জড়তা একেবারে চলিয়া যাইবে। তিনি আমাদের পরম সুহৃৎ, এবং শক্তিতে অনন্ত, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া সকল শোক সকল হৃদয় বেদনা হইতে উত্তীর্ণ হও। তাঁহার প্রতি প্রীতিকে ঊর্দ্ধমুখে যাইতে দেও, প্রীতি কেমন অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে। সেই প্রীতি আবার যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া সংসারের নিম্ন প্রদেশে ফিরিয়া আসিবে, তখন তাহা আর মলিন হইবে না। সেই প্রেম স্বরূপে আমাদের প্রীতি সংস্থাপন করিয়া তাঁহাকে আমাদের জীবন চক্রের মধ্য বিন্দু জানিয়া যে কার্য্যেই রত হই না কেন, তাহাই এক সুন্দর বেশ ধারণ করে। তখন ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন তাঁহার মনন ও নিদিধ্যাসন সুখ জনক, আর তাঁহার সাংসারিক কার্য্য করা অসুখজনক এমত বোধ হয় না। তখন মস্তিষ্কের কার্য্য শ্রেষ্ঠ এবং হস্তের কার্য্য কনিষ্ঠ বোধ হয় না। তখন কর্ম্মশালী হওয়া তাঁহার এক মহা নিয়ম জানি, এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশ্রম সকলই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করি। এই রূপে তাঁহাতে হৃদয় অর্পণ করিতে পারিলে আমাদের সকল অভাব চলিয়া যায়, সুখের হিল্লোল আসিয়া আমাদিগকে প্রফুল্ল করিতে থাকে। হা! কবে আমাদের এমত সৌভাগ্য হইবে যে, সেই সুখ স্বরূপ প্রেম স্বরূপ ভূমা ঈশ্বরেতে আমাদের প্রাণ মন আত্মা সমস্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে পারিব। আমাদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার সম্পূর্ণ অনুযায়িনী হইবে, আমাদের মনে কেবল নির্ম্মল অভিপ্রায়ই নিয়ত বিরাজ করিবে। তখন হৃদয়-শুষ্ককারী নৈরাশ্যের যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে হইবে না। তখন সফলতা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। তখন আনন্দ ও সুখ চারিদিক হইতে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে। আমাদের অন্তর-দৃষ্টি তখন প্রশস্ততা লাভ করিবে, এবং সংসারের সমস্ত ঘটনা এক নৈসর্গিক সম্বন্ধাবলিতে বদ্ধ দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইতে থাকিব। তখন সংসারের সম্পদ্ যেমন সেবনীয়, সংসারের বিপদও তদ্রূপ সেবনীয় জানিতে

পারিব, ঘোরতর বিপদের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গল হস্তের চিহ্ন দেখিয়া স্বাস্থ্যকর শিক্ষা লাভ করিব। এই রূপে তাঁহাতে যখন সম্পূর্ণ হৃদয় মন সমর্পণ করিতে পারিব, যখন আত্মার নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়া পরমাত্মার সুন্দর প্রকাশ তথায় অবিচ্ছেদে দেখিতে পাইব, তখন আমাদের সকল কামনার পরি সমাপ্তি হইবে, আমাদের সকল লোক প্রাপ্তি হইবে "স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্ত-মাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি"। যিনি পরমাত্মাকে অন্বেষণ করিয়া জানিতে পারেন, তাঁহার সকল লোক প্রাপ্তি হয় এবং সকল কামনা সিদ্ধ হয়। ইহারই জন্য আমাদের সকল শিক্ষা, এই অবস্থাই আমাদের প্রার্থনীয়, এই অবস্থা প্রাপ্তিই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য।

হে সুখ স্বরূপ প্রেম-স্বরূপ পরমেশ্বর! হে মঙ্গল পূর্ণ স্নেহময় পিতা! এই ভয়াবহ সঙ্কট পূর্ণ সংসার-বিচরণ কালে যদি তোমার প্রতি নির্ভর করিয়া, তোমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আমরা চলিতে পারি, তবে কেমন অকুতোভয়ে আমরা প্রতিপদ নিক্ষেপ করি, আমাদের হৃদয় কেমন উৎসাহ পূর্ণ হয়, সমস্ত আপদ সমস্ত বিপত্তি সূর্য্য প্রকাশে কুজ্ঝটিকার ন্যায় তিরোহিত হইয়া যায়, আমরা কেমন আরাম প্রাপ্ত হই। কিন্তু মোহ আসিয়া আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তোমার হস্তকে দেখিতে দেয় না, এবং তোমা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখে। আমরা অন্ধ ভাবে ক্ষুদ্র অথবা মলিন বিষয়ের প্রতি ধাবমান হইয়া অশান্তি ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা ভোগ করি। হে পিতঃ! আমাদিগকে রক্ষা কর, মোহের কঠোর হস্ত হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর, আমরা যেন প্রকৃত শাশ্বত সুখকে আর জলাঞ্জলি না দিই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

———০———

দশম উপদেশ।

১০ মাঘ শনিবার ১৭৯১ শক।

এই মাঘ মাসের প্রথম দিবস হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। তাহার প্রথম দিনের উপদেশে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি, গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণের আবশ্যকতা, ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ, উপদেষ্টার লক্ষণ, ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ, ও তাঁহাকে পাইবার উপায়, ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় দিনের উপদেশে, জীবাত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন, জীবাত্মার সহিত শরীরাদির সম্বন্ধ, জীবাত্মার স্বরূপ, এবং আত্ম-জ্ঞান, ও মুক্তির উপায়, এই সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

তৃতীয় দিনের উপদেশে, বহির্বিষয় কামনা হইতে প্রমুক্ত হইয়া ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ, ঈশ্বর-লাভের উপায়, ও তল্লাভের ফল, ইত্যাদি বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুর্থ দিনের উপদেশে, জীবাত্মার অবিনাশিত্ব, তাহার স্বাধীনতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহার প্রতি প্রীতি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, ও আত্মোন্নতি, ইত্যাদি বিষয় ব্যক্ত করা হইয়াছে।

পঞ্চম দিনের উপদেশে, মনোবৃত্তি সকলকে নিয়মিত করিবার উপায়, অসৎ কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তির ফল, ও আত্মাকে পবিত্র করিয়া জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর লাভ, এই সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠ দিনের উপদেশে, মোহ নিদ্রা 'হইতে উত্থান, আত্মাকে পাপ সংস্পর্শ হইতে সংশোধন, ও ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ, ইত্যাদি বিষয় সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

সপ্তম দিবসের উপদেশে, ঈশ্বরের মহিমা দর্শন, আত্মার উন্নতি, বিষয়াবরণ ভেদ করিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান ও লাভ সহজ জ্ঞানে ব্রহ্ম লাভ, এই সসল বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে।

অষ্টম দিবসের উপদেশে, ধর্ম্ম সাধনের উপায়, অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ, ধর্ম্ম-চিন্তা এবং আপনার কর্ত্তব্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

নবম দিনের উপদেশে, ঈশ্বরের নিয়ম পালন, তাঁহার কার্য্য দর্শন, পরোপকার ও আত্মোন্নতি ইত্যাদি বিষয় সকল বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

অদ্য ১০ই মাঘ, অদ্যকার উপদেশে, ব্রহ্মোপাসনার অন্তরঙ্গ সাধন, অধিকারী নিরূপণ, উপাসনায় সম্ভাবিত বিঘ্নের শান্তি, ও উপাসনার স্বরূপ ইত্যাদি বিষয় উক্ত হইতেছে।

শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো
ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি ॥

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, ও সমাহিত হইয়া আপনাতেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা এবং সমাধান এই পাঁচটী ব্রহ্মোপাসনার পত্তন ভূমি। পত্তন ভূমির কাঠিন্য ও মৃদুতানুসারে তদুপরিস্থ ভিত্তির স্থায়িত্ব নির্ণীত হইয়া থাকে। পত্তন ভূমি যত দৃঢ় হইবে—যত কঠিন হইবে—যত শক্ত হইবে; তাহার উপরে স্থাপিত ভার বিশিষ্ট ভিত্তি তত দৃঢ় হইবে—তত অটল হইবে—তত চিরস্থায়ী হইবে। কোন অট্টালিকা বা কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার সময়ে তাহার ভিত্তির পত্তন ভূমিকে যত দৃঢ় করা যায়—যত কঠিন করা যায়—যত শক্ত করা যায়; ততই তাহা অটল হয়, দৃঢ়তর হয় ও চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু যদি বালুকাময় মৃদু ভূমির উপরে তাহার পত্তন করা হয়, তাহা হইলে তাহা অচির কাল মধ্যে নিম্নে অবনত হইয়া বিদীর্ণ বা ভূমিশাৎ হয়। তদ্রূপ ব্রহ্মোপাসনার পত্তন ভূমি এই শম দমাদি যত অভ্যস্ত হইবে—যত আয়ত্ত হইবে—যত দৃঢ়ীভূত হইবে; তাহার সাহায্যে স্থাপিত ব্রহ্ম-দর্শন তত দৃঢ় হইবে—তত অনায়াস সাধ্য হইবে—ততই চিরস্থায়ী হইবে। যদি এই শম দমাদি দৃঢ়াভ্যস্ত না হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম-দর্শন স্থিরতর ও চিরস্থায়ী হয়

না। অতএব এই শম-দমাদির স্বরূপ অবগত হইয়া তাহারদিগের প্রতিবন্ধ নিরাশ পূর্ব্বক তাহারদিগকে অভ্যস্ত ও দৃঢ় করিবার জন্য তাহারদিগের স্বরূপ বর্ণন করা যাইতেছে।

ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করার নাম শম। এবং ব্রহ্ম ভিন্ন বিষয় হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করার নাম দম। সাংসারিক ব্যবহার সময়ে মন ও ইন্দ্রিয়গণ নানা বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া থাকে, অতএব ব্রহ্ম-দর্শন-কালে তাহারদিগকে তাহা হইতে আকর্ষণ ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।

অন্য বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের তাহা হইতে নিরত্ত হওয়ার নাম উপরতি। বাহ্য বিষয়ে বিরক্তি* না জন্মিলে পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় সকল তাহাতে ধাবিত হইতে পারে, অতএব তাহা হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিরত করা আবশ্যক।

সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে। সহিষ্ণুতা ব্যতীত অনেক সময়ে নানা বিষয়ে উত্তেজিত হইতে হয় এবং উত্তেজিত হইলে মনের একাগ্রতা হয় না, সুতরাং ব্রহ্মদর্শন ক্ষণিক হইয়া উঠে। অতএব নির্ব্বিঘ্নে ব্রহ্মদর্শন দৃঢ় করিবার জন্য তৎকালে অনেক বিঘ্ন সহ্য করা অভ্যাস করিতে হইবে।

পরব্রহ্মেতে মনের সমাধান পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করার নাম সমাধি। চিন্তা যদিও এক কালে দুইটী বিষয় ধারণ করিতে পারে না, তথাপি এক বিষয় চিন্তার শেষ না হইতে হইতে তাহার মধ্যে অন্য বিষয় চিন্তা উপস্থিত হইতে পারে, অতএব তাহা নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাতে মনের সমাধান পূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

উক্ত সমাধান দুই প্রকার। সবিকল্প সমাধি ও নির্ব্বিকল্প সমাধি।

সমাধি অবস্থায় কর্ত্তা ক্রিয়া কর্ম্ম এই ত্রিবিধ বোধ সত্ত্বেও, মৃন্ময় সিংহ জ্ঞান কালে মৃত্তিকা জ্ঞানের ন্যায়, প্রস্তরময় অশ্ব জ্ঞান সময়ে প্রস্তর জ্ঞানের ন্যায়, স্বর্ণময় অলঙ্কার জ্ঞান কালে স্বর্ণ জ্ঞানের ন্যায়,

* বিরক্তি শব্দের অর্থ—বিষয়ে উন্মত্ত না হওয়া। সন্ন্যাস আশ্রয় নহে।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে মনের যে অবস্থান—তদ্গতচিত্ততা, তাহার নাম সবিকল্প সমাধি।

আর কর্ত্তা ক্রিয়া এই দুইটী প্রকার বোধ না থাকিয়া লবণ মিশ্রিত জলে চক্ষুরাদি দ্বারা কেবল জলমাত্র জ্ঞানের ন্যায়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতে নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় সমান ভাবে মনের যে অবস্থান—তন্ময় হওয়া, তাহাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা এই স্থলে "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম, এই রূপ উপদেশ দেন, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়োভবেৎ" "প্রণব ধনুঃস্বরূপ, জীবাত্মা শর স্বরূপ এবং পরব্রহ্ম লক্ষ্য স্বরূপ; প্রমাদ শূন্য হইয়া সেই প্রণবধনুর অবলম্বনেতে জীবাত্মা রূপ শর দ্বারা ব্রহ্ম-রূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবেক। আর যেমন শর লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হয়, তদ্রূপ জীবাত্মা ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে আবৃত হইবে" তাঁহার সহিত মিশ্রিত হইবে না।

এই উভয় বিধ সমাধির সাত প্রকার সাধন। যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, প্রত্যাহার. ধারণা, এবং ধ্যান।

অহিংসা, সত্য ব্যবহার, অচৌর্য্য ও ব্রহ্মচর্য্য, এই কয়টির নাম যম।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধান, এই গুলির নাম নিয়ম।

কর চরণাদির সংস্থান বিশেষ ও বক্ষ গ্রীবা শিরোদেশ উন্নত দ্বারা সমভাবে শরীর স্থাপন করার নাম আসন।

প্রাণ প্রভৃতি শরীরস্থ বায়ুগণকে আয়ত্ত করাকে প্রাণায়াম বলে।

ইন্দ্রিয়গণকে স্বীয় স্বীয় বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার ও পুর্ব্বোক্ত দম সামান্যত এক অর্থে দুইটীরই প্রয়োগ হইয়াছে কিন্তু তাহার মধ্যে এই মাত্র বিশেষ আছে, যে দম শব্দের অর্থ—দমন করা—ইন্দ্রিগণকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে না দেওয়া, আর প্রত্যাহার শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়গণ যদি

স্বস্ব বিষয়ে গমন করে, তবে তাহারদিগকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করা।

পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের ধারণ করাকে ধারণা কহে।

পরব্রহ্মেতে অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রবাহের নাম ধ্যান।

এই সাত্তটী সাধন বিশিষ্ট উভয় প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান কালে—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ নামে চারিটী বিঘ্ন সম্ভব হয়।

তাহার মধ্যে সত্য জ্ঞান অনন্ত স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে যে নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার নাম লয়। এই প্রকার লয়রূপ বিঘ্ন আবির্ভূত হইলে, অন্তঃকরণকে উদ্বোধিত করিবেক। এই জন্যই প্রতি উপাসনার পূর্ব্বে উদ্বোধন করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম চৈতন্য ভ্রমে অন্তঃকরণের যে অন্যাবলম্বন, তাহাকে বিক্ষেপ বলা যায়। এই বিক্ষেপ উদিত হইলে সাবধানে তাহার শমতা করিবেক।

বস্তু বিশেষের প্রতি অনুরাগ বশতঃ ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করিতে না পারিয়া অন্তঃকরণের নিস্তব্ধ ভাবের নাম কষায়। এই রূপ নিস্তব্ধ ভাবে অন্তঃকরণ কষায়িত হইলে যত্ন পূর্ব্বক তাহা নিবারণ করিবেক।

অদ্বিতীয় ব্রহ্মরস ভ্রমে বিষয়রস আস্বাদন করার নাম রসাস্বাদ। সমাধিকালে এই রূপ বিষয় রসাস্বাদ অনুভূত হইলে সতর্কতা পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মরস আনয়ন করিবেক।

এই সকল বিঘ্ন হইতে বিরহিত অন্তঃকরণ যখন নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় অচল হইয়া অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মনস্ক হইয়া ব্রহ্মরস আস্বাদন করে, এতদ্রূপ অবস্থাকে সমাধি কহা যায়। এই রূপে শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত হইলে পর স্বীয় আত্মাতে পরব্রহ্মকে দর্শন করিবার অধিকার জন্মে, এতদ্ভিন্ন অসংস্কৃত আত্মাতে তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। এবম্প্রকার সাধন সম্পন্ন হইয়া স্বীয় সংস্কৃত আত্মাতে পরমাত্ম দর্শনে অধিকার জন্মিলে, তখন—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

"পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।"

দর্শন ,শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই চারিটী ব্রহ্মোপাসনার আবরণরূপ ভিত্তি। যেমন কোন প্রয়োজনীয় প্রিয় বস্তু ভিত্তি রূপ অভেদ্য আবরণে আবৃত হইলে তাহাকে হঠাৎ কেহ অপহরণ করিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ এই দর্শন শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন রূপ অভেদ্য আবরণে আবৃত অতি প্রিয় ব্রহ্মোপাসনাতে কাম ক্রোধাদি রিপুগণ আর কোন প্রকার বিঘ্ন দিতে সমর্থ হয় না, এনিমিত্তে তাহাকে দৃঢ় আবরণে আবৃত করিবার জন্য তাহারদিগের স্বরূপ বিবৃত হইতেছে।

ব্রহ্মের এই বিশ্বকার্য্যে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমা প্রতীতি করিয়া সকলের প্রাণ রূপে তাঁহাকে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান জানার নাম ব্রহ্ম দর্শন। কিন্তু " ব্রহ্মেতে অনুরাগ ভিন্ন ব্রহ্ম দর্শন নিষ্ফল, অনুরাগের আলোকে ঈশ্বর আমারদিগের নিকটে যাদৃশ প্রকাশিত হয়েন, এমন আর কিছুতেই হন না। অনুরাগের এরূপ প্রভা যে, যে জ্ঞান প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, তাহা অনুরাগের প্রভাবে সমুজ্জ্বলিত হয়; যে সত্য ছায়ার ন্যায় মনে হয়, তাহা প্রদীপ্ত হয়; যে ধর্ম্ম আয়াস-সাধ্য অতি কঠোর, তাহাও মধুর রূপে প্রতীয়মান হয়। ঈশ্বরই আমারদের সেই অনুরাগের প্রেরয়িতা এবং তিনি নিজেই তাহার বিষয়।"

তাঁহার মহিমা প্রতি পাদক উপদেশ বাক্য সকলের সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মেতেই তাৎপর্য্য* এইরূপ অবধারণ করাকে শ্রবণ কহে। উপদেশ বাক্যে ধর্ম্মে অনুরাগ ও বিষয়ে বিরাগ শিক্ষা হয়, সেই শিক্ষার

* একটী শব্দের নানা প্রকার অর্থ হইতে পারে, কিন্তু বক্তা তাহা কোন্ অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করার নাম তাৎপর্য্য-অবধারণ, এই তাৎপর্য্য অবধারণের ছয়টী উপায় আছে, উপক্রম উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ এবং উপপত্তি। যেমন সৈন্ধব শব্দের অর্থ লবণ ও ঘোটক, কিন্তু যদি কেহ ভোজনে বসিয়া সৈন্ধব আনয়ন করিতে বলেন, তখন লবণ আনয়ন করাই বক্তার তাৎপর্য্য, ঘোটক নহে, ইহাই তাৎপর্য্যাবধারণ।

প্রভাবে যতই তাহাতে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, ততই তাহাতে আগ্রহ জন্মে। অতএব উপদেশ বাক্য সকল শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করা অত্যন্ত আবশ্যক।

উক্ত রূপে দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তদনুকূল যুক্তি দ্বারা পরস্পর পুনঃ পুন তাহার আলোচনা করাকে মনন কহা যায়। আলোচনা করাতে যে কেবল জ্ঞানের দৃঢ়তা হয় এমত নহে, আলোচনায় নূতন নূতন জ্ঞানেরও আবিষ্কার হয়, আলোচনার বলে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকলও ক্রমশ আয়ত্ত ও সহজ হইয়া উঠে।

বিরোধী বিষয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক অন্তঃকরণে ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞানের প্রবাহের নাম নিদিধ্যাসন। বিষয় হইতে মন যত আকৃষ্ট হয়, বিষয়ের অতীত পদার্থের প্রতি তাহা ততই ধাবমান হইতে থাকে, যে পরিমাণে বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হয়, ঈশ্বরে অনুরাগ সেই পরিমাণে উজ্জ্বল হয়। ঈশ্বরে অনুরাগ যেমন প্রবল হইতে থাকে, তেমনি ধর্ম্মবল আরো বৃদ্ধি হইতে থাকে, বিষয়াকর্ষণ আরো ক্ষীণ হইয়া যায়।

এই রূপ সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি যে প্রকারে পর-ব্রহ্মোপাসনা করিবেন, ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার অতি সহজ ও সুন্দর উপদেশ সকল প্রদত্ত হইয়াছে, তাহারই বিবরণ এস্থলে উক্ত হইতেছে।

"আত্মানমেব প্রিয় মুপাসীত।"

"পরমাত্মাকেই প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক।"

পরব্রহ্মোপাসনা দুইটী অবয়বে বিভক্ত। প্রথম তাঁহার প্রতি প্রীতি; দ্বিতীয় তাঁহার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান। এই দুইটী অবয়বই পরস্পর সাপেক্ষ, কারণ প্রীতি ভিন্ন প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান হয় না এবং প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রীতি প্রকাশ পায় না। যে বন্ধুর প্রতি যাঁহার যত প্রীতি, তাঁহার প্রিয় বস্তুর প্রতি তাঁহার তদ্রূপ প্রীতি হইবেই হইবে। যদি বন্ধুর প্রিয় বস্তুর প্রতি প্রীতি না হয়, তাহা হইলে সে বন্ধুর প্রতি তাঁহার কথনই প্রীতি নাই।

এই রূপ গুরু, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি সকল বস্তুর প্রতিই প্রীতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই সকল বস্তুর প্রতি যে প্রীতি তাহা কেবল প্রীতি মাত্র, তাহা পরম প্রীতি নহে; আর পরমাত্মার প্রতি যে প্রীতি, তাহাই পরম প্রীতি; যেহেতু অন্য যে কোন বস্তুর প্রতি যে প্রীতি হয়, তাহা কেবল ঈশ্বরের প্রিয় বস্তু বলিয়া প্রীতি হয় কিন্তু পরমাত্মার প্রতি যে প্রীতি, তাহা অন্য বস্তুর নিমিত্তে নহে, তাহা কেবল প্রীতি স্বরূপ বলিয়া প্রীতি হইয়া থাকে।

এই সকল বন্ধু বান্ধব গুরু প্রিতৃ ও স্ত্রী পুত্রাদি বাহ্য বস্তু বিষয়ে যে প্রীতি, তাহা পৃথক্ পৃথক্ আকারে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদি বিষয়ে যে প্রীতি, তাহার নাম অনুরাগ; উপাসনা অর্চ্চনাদি বিষয়ে যে প্রীতি, তাহার নাম শ্রদ্ধা; গুরু, প্রিতৃ, উপদেষ্টা প্রভৃতির প্রতি যে প্রীতি, তাহার নাম ভক্তি; অপ্রাপ্ত বস্তু বিষয়ে যে প্রীতি, তাহার নাম ইচ্ছা; এ সমুদায় প্রীতিই কোন এক প্রকার নিমিত্ত জন্য, নিমিত্তের সদ্ভাব বা অসদ্ভাবে তাহারও সদ্ভাব ও অসদ্ভাব হয়, কিন্তু পরমাত্মার প্রতি যে প্রীতি তাহা কোন নিমিত্ত জন্য নহে, তাহার কখন অসদ্ভাব হয় না ও তাহা কখন অন্য আকারে পরিণতও হয় না, তাহা পরম প্রীতি; অতএব ঈশ্বর নিত্য প্রীতির আধার, তিনি পরম প্রীতির আস্পদ। "তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, তিনি বিত্ত হইতে প্রিয়, তিনি আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়;" সুতরাং তিনি পরমানন্দ স্বরূপ। যখন যে কোন বস্তুর প্রতি প্রীতি হয় তাহাতেই আনন্দের উদয় হয়, অতএব পরমাত্মার প্রতি পরম প্রীতি হয় বলিয়াই তাঁহাতে পরমানন্দের উদ্ভব হয়, সুতরাং তিনি পরমানন্দ স্বরূপ।

পরমাত্মা যদি পরমানন্দ স্বরূপ হইলেন, তবে এখন বিবেচ্য এই যে তাঁহার সেই পরমানন্দ রূপ প্রকাশিত হয় কি না, কেননা বস্তুর সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ গোচর না হইলে তাহাতে প্রীতির উদয় হয় না, যে বস্তুর সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ হয়, তাহাতেই প্রীতি উদিত হয়, সুতরাং আনন্দ উদ্ভূত হইয়া থাকে; অতএব পরমাত্মার পরমানন্দরূপ প্র-

ত্যক্ষ হয় কি না। যদি তাহা প্রত্যক্ষ না হয়, তবে তাঁহাতে পরম প্রীতিও না হউক; আর যদি তাহা প্রত্যক্ষ হয়. তাহা হইলে সাংসারিক ব্যবহার কালে আর বিষয়ানন্দে স্পৃহা না থাকুক; কারণ যাঁহার আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া বিষয় ভোগে আনন্দ অনুভব হয়, সেই পূর্ণ আনন্দ প্রত্যক্ষ হইলে আনন্দকণাবিশিষ্ট বিষয় সকল তখন আনন্দ প্রদান করিতে আর কি প্রকারে সমর্থ হইবে।

অতএব পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও সাংসারিক ব্যবহার কালে অপ্রত্যক্ষের ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। যেমন দশ জন একত্র সমস্বরে গান করিলে তাহার মধ্যে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির স্বর বিশেষ রূপে লক্ষিত হয় না কিন্তু সূক্ষ্মরূপে প্রত্যক্ষ হয়। যেমন অনেকে একত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ্য শ্রুতি উচ্চারণ করিলে তাহার মধ্যে কোন এক বিশেষ ব্যক্তির স্বর বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ হয় না কিন্তু সূক্ষ্মরূপে লক্ষিত হয়, তদ্রূপ পরব্রহ্মের পরমানন্দ স্বরূপ বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ না হইলেও অতি সূক্ষ্ম রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সমস্বরে গান বা উচ্চৈঃস্বরে শ্রুতি পাঠ বিষয়ে বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ হইবার প্রতিবন্ধক যেমন অনেকে একত্র উচ্চারণ, তদ্রূপ সাংসারিক ব্যবহার কালে পরব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপ বিশেষ রূপে প্রত্যক্ষ হইবার প্রতিবন্ধক বিষয়াবরণ ও অজ্ঞান "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।" "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।" পরব্রহ্ম প্রতি বিষয়ের অভ্যন্তরে গূঢ়রূপে বর্ত্তমান আছেন, কোষ হইতে অসি আকর্ষণ করার ন্যায় জ্ঞানবলে বিষয়াবরণ হইতে তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়া অজ্ঞানতা দূরীকরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া যায়।

অজ্ঞান কোন বস্তু নহে, না জানার নামই অজ্ঞান। অস্তি ভাতি এই রূপ ব্যবহার যোগ্য সত্য বস্তুকে নাস্তি ন ভাতি এই রূপ অসত্য ভাবে প্রতীতি করার নামই অজ্ঞান, তাহাই এস্থলে প্রধান প্রতিবন্ধক; আর জানার নামই জ্ঞান; এই জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশক; অতএব এই বিষয়াবরণ ও অজ্ঞান রূপ প্রতিবন্ধক হইতে উত্তীর্ণ

হইয়া বিষয়ের মধ্য হইতেই পরমাত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রিয় রূপে উপাসনা করিবেক এবং অমৃতত্ব পাইয়া কৃতার্থ হইবেক।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মোপদিষ্ট ঈশ্বরোপাসনাতে কোন সম্প্রদায়ের বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবনা নাই, কারণ যিনি যে সম্প্রদায়ী হউন প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানই যে উপাসনা, তাহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যিনি যেরূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করুন, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান যে তাঁহার উপাসনা, কখনই তাঁহারা ইহার অন্যথা বলিবেন না। কেবল এই প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যের ভাব বিকৃত করিয়া লওয়াতে তাঁহারা অমৃত লাভে বঞ্চিত ও অনর্থে নিপতিত হইতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, গললগ্নীকৃত-বস্ত্রে গদ্‌গদ বাক্যে অর্থ না বুঝিয়াও সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেই প্রীতি করা হইল এবং পশু-বলি প্রভৃতি নৃশংস আড়ম্বর সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। প্রীতি যে হৃদয়ের ভাব ও প্রিয়কার্য্য যে হৃদয় হইতে উদিত হইয়া বাহ্য আকারে পরিণত হয়, তাহা তাঁহারা মনেও করেন না। তাঁহারা যেরূপেই বিকৃত করুন, প্রীতি ও প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান ভিন্ন যে উপাসনা হয় না, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিয়াই থাকেন, তদ্বিষয়ে তাঁহারদিগের কিছুমাত্র বিপ্রতিপত্তি নাই। যেমন পিতাকে পিতা বলিয়া পরিচয় দিতে কোন পুত্রের আপত্তি হয় না, কিন্তু পিতার ত্যাজ্য বিষয় লইয়াই ভ্রাতায় ভ্রাতায় নানা বিরোধ হইয়া থাকে। সেই রূপ যিনি যে ভাবে বিকৃত করুন, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান যে ঈশ্বরের উপাসনা, তাহাতে কাহারো কোন বিরোধ নাই, কেবল বাহ্য আড়ম্বর লইয়াই নানা দেশে নানা মত ও নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এই রূপ মত ভেদ অবলম্বন করিয়াই এদেশে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচ প্রকার সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এক্ষণে আরও নানাপ্রকার সম্প্রদায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহারদিগের মধ্যে এতদূর মতভেদ ও এত বিদ্বেষ আছে, যে এক সম্প্রদায় যে রূপ অনুষ্ঠান করেন, অন্য সম্প্রদায় তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া-

থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম্ম এবম্প্রকার বিদ্বেষ ও বিরোধের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হইয়া সেই সকল বিরোধের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। অতএব কালে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এই সর্ব্বতোমুখী উপদেশ বাক্য সকল সর্ব্ব সাধারণ্যে বিস্তৃত হইলে আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ বিসম্বাদ থাকিবেনা, সকলেই অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

হে পরমাত্মন্! আমরা সংসারের অনিত্য বস্তুর প্রতি প্রীতি স্থাপন করিয়া শোক দুঃখে দীপ্তশিরা হইতেছি, বিষয়াকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া অমৃত পথ ভুলিয়া রহিয়াছি। তুমি আমারদিগকে তোমার পথ প্রদর্শণ কর, মুক্তির অধিকারী কর। হে বিশ্বেশ্বর! আমরা যদি দুর্ব্বল বুদ্ধিতে তোমার সূক্ষ্ম নিয়ম সকল বুঝিতে না পারিয়া কখন অপথে পদার্পণ করি, তাহা হইলে তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগকে তোমার সৎপথে লইয়া যাও, আর কখন যেন অসৎ পথে পুনর্গমন করিতে না হয়। হে ঈশ্বর! তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং